নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

নবম–দশম শ্রেণি

রচনা

মুনীর চৌধুরী

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

সম্পাদনা

ইব্রাহীম খলিল

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন। এই বিবেচনার আলোকেই ১৯৯৪ সালে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি 'শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স প্রণীত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনায় উক্ত স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়।

পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে রচিত পুস্তকগুলো প্রবর্তনের পর আরও কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে পাঠ্যপুস্তকটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশোধিত ও পরিমার্জিত এই সংস্করণ যথাসম্ভব নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়।বাংলা আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এ ভাষায় ব্যবহারিক ও সৃজনশীল–উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলা ভাষার ধারণশক্তি ও প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করে এর যুগোপযোগী, ভাবোপযোগী ও বিষয়োপযোগী শুদ্ধ প্রয়োগ করতে হবে; সেজন্য বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধিত ও পরিমার্জিত **'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'** নবীন ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এ প্রয়োজন অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

আমরা জানি – 'শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।' সময় ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পরিমার্জন, পরিবর্তন ও উন্নয়ন একটি স্বাভাবিক কর্মধারা। তাই এ বইয়ের আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে এ বইয়ে কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও যৌক্তিক মূল্যায়নসহ, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রমদান করেছেন তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হলো, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা

মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য **কণ্ঠধ্বনি** এবং হাত, পা, চোখ ইত্যাদি **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের** সাহায্যে **ইঙ্গিত** করে থাকে। **কণ্ঠধ্বনির** সাহায্যে মানুষ যত বেশি পরিমাণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, **ইঙ্গিতের** সাহায্যে ততটা পারে না। আর **কণ্ঠধ্বনির** সহায়তায় মানুষ মনের **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম** ভাবও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। **কণ্ঠধ্বনি** বলতে মুখগহ্বর, কণ্ঠ, নাক ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বোঝায়। এই ধ্বনিই ভাষার মূল উপাদান। এই ধ্বনির সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি হয়। আবার ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা। গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক ইত্যাদি **বাক্ প্রত্যঙ্গকে** এক কথায় বলে বাগ্‌যন্ত্র। এই **বাগযন্ত্রের** দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে **ভাষা** বলে।

সকল মানুষের ভাষাই বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট। তবুও একই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা।

দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। সে ভাষাও আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। ফলে, এ শতকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে, হাজার বছর আগেকার মানুষের ভাষা ঠিক এমনটি ছিল না।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

বাংলা ভাষারীতি

কথ্য, চলিত ও সাধু রীতি

বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের লোকের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান–প্রদানে অন্তরায় দেখা দিতে পারে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিতসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান–প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্য রীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি : একটি চলিত কথ্য রীতি অপরটি আঞ্চলিক কথ্য রীতি।

বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি : একটি চলিত রীতি অপরটি সাধু রীতি ।

বাংলা ভাষার এ প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায়
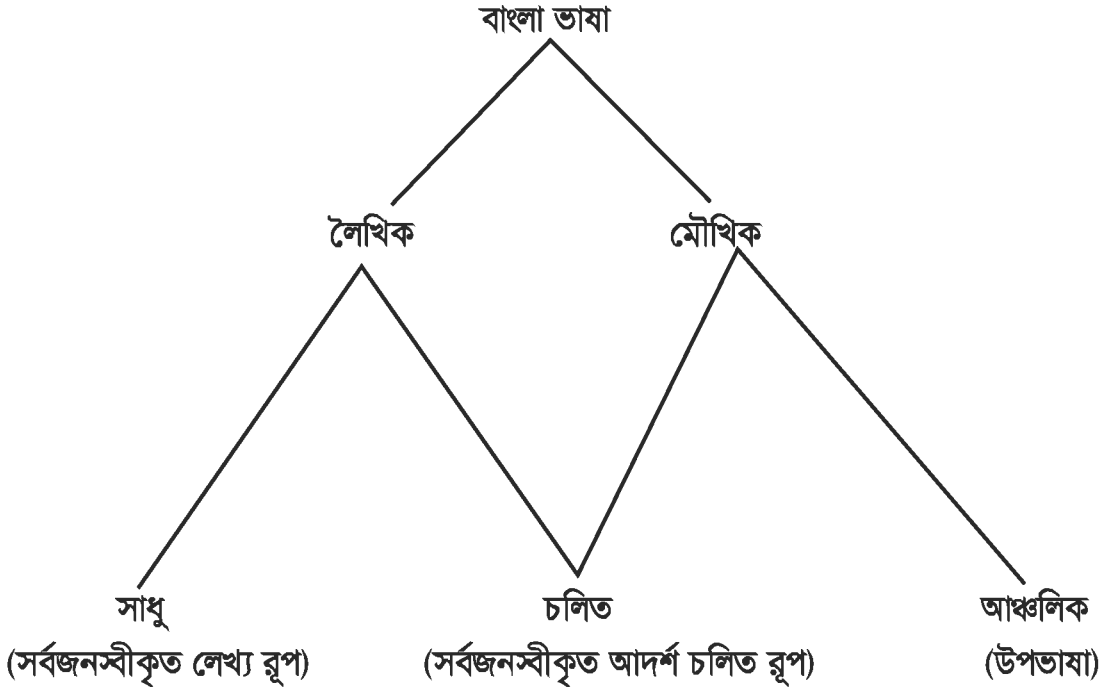
সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

১. সাধু রীতি

(ক) বাংলা লেখ্য সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।

(খ) এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।

(গ) সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।

(ঘ) এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।

২. চলিত রীতি

(ক) চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।

(খ) এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।

(গ) চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।

(ঘ) সাধু রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।

৩. আঞ্চলিক কথ্য রীতি

সব ভাষারই আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্য থাকে, বাংলা ভাষারও তা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; আবার কোথাও কোথাও কারো কারো উচ্চারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়।

সাধু, চলিত ও কথ্য রীতির উদাহরণ

ক. সাধু রীতি

পরদিন প্রাতে হেডমাস্টার সাহেবের প্রস্তুত লিস্ট অনুসারে যে তিনজন শিক্ষক **সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ** করিবার অনুমতি **পাইয়াছিলেন, তাঁহারা** আটটার **পূর্বেই** ডাক-বাংলায় **উপস্থিত হইলেন**। একটু পরে আবদুল্লাহ **আসিয়া** হাজির **হইল**। **তাহাকে দেখিয়া** একজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা **করিলেন**– আপনি যে! আপনার নাম তো হেডমাস্টার লিস্টে **দেন নাই**।

–কাজী ইমদাদুল হক

খ. চলিত রীতি

পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান **পড়ল**। তারি **মধ্য দিয়ে** রাস্তা। মচমচ **করে শুকনো** বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা **জুতোর** নিচে **ভেঙে যেতে লাগল**। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় **বুনো** গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথা**জুড়ে** সাদা সাদা **তুলোর** মতো রাধালতার ফুল **ফুটে রয়েছে**।

–বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপরের ‘ক’ ও ‘খ’ অনুচ্ছেদ দুটির ভাষার উপাদানে সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য নিচে দেখানো হলো–

পদ	সাধু	চলিত
বিশেষ্য	মস্তক	মাথা
বিশেষ্য	জুতা	জুতো
বিশেষ্য	তুলা	তুলো
বিশেষণ	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
বিশেষণ	বন্য	বুনো
সর্বনাম	তাঁহারা/উঁহারা	তাঁরা/ওঁরা
সর্বনাম	তাহাকে/উহাকে	তাকে/ওকে
সর্বনাম	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর
ক্রিয়া	করিবার	করবার/করার
ক্রিয়া	পাইয়াছিলেন	পেয়েছিলেন
ক্রিয়া	হইলেন	হলেন
ক্রিয়া	আসিয়া	এসে
ক্রিয়া	হইল	হল/হলো
ক্রিয়া	দেখিয়া	দেখে
ক্রিয়া	করিলেন	করলেন
ক্রিয়া	দেন নাই	দেননি
ক্রিয়া	পার হইয়া	পেরিয়ে
ক্রিয়া	পড়িল	পড়ল/পড়লো
ক্রিয়া	করিয়া	করে
ক্রিয়া	ভাঙিয়া যাইতে লাগিল	ভেঙে যেতে লাগল
ক্রিয়া	ফুটিয়া রহিয়াছে	ফুটে রয়েছে
অব্যয়	পূর্বেই	আগেই
অব্যয়	সহিত	সঙ্গে/সাথে।

বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

বাংলা ভাষা গোড়াপত্তনের যুগে স্বল্প সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে এর শব্দ–সম্ভার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন পত্তনের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। বাংলা ভাষা ঐ সব ভাষার শব্দগুলোকে আপন করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্ভারের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পণ্ডিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন –

১. তৎসম শব্দ ২. তদ্ভব শব্দ ৩. অর্ধ–তৎসম শব্দ

৪. দেশি শব্দ ৫. বিদেশি শব্দ

১. তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার)+ সম (সমান)]=তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত। উদাহরণ : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

২. তদ্ভব শব্দ : যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, 'তৎ' (তার) থেকে 'ভব' (উৎপন্ন)। যেমন – সংস্কৃত–হস্ত, প্রাকৃত–হত্থ, তদ্ভব–হাত। সংস্কৃত–চর্মকার, প্রাকৃত–চম্মআর, তদ্ভব–চামার ইত্যাদি। এই তদ্ভব শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

৩. অর্ধ–তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ–তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ তৎসম মানে আধা সংস্কৃত। উদাহরণ : জ্যোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নী, বোস্টম, কুচ্ছিত– এ শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কুৎসিত শব্দ থেকে আগত।

৪. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন–কুড়ি (বিশ)–কোলভাষা, পেট (উদর)–তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)–মুণ্ডারী ভাষা। এরূপ–কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি ইত্যাদি আরও বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

৫. বিদেশি শব্দ : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি– এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মায়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

ক. আরবি শব্দ : বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়–

(১) **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ :** আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল ইত্যাদি।

(২) **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ :** আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায় ইত্যাদি।

খ. ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ :** খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।

(২) **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ :** কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।

(৩) **বিবিধ শব্দ :** আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ : ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারের পাওয়া যায়–

(১) **অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে :** ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।

(২) **পরিবর্তিত উচ্চারণে :** আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার শব্দ

(১) পর্তুগিজ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি ইত্যাদি।

(২) ফরাসি : কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

(৩) ওলন্দাজ : ইস্কাপন, টেক্‌কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।

ঙ. অন্যান্য ভাষার শব্দ

(১) গুজরাটি : খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।

(২) পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।

(৩) তুর্কি : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

(৪) চিনা : চা, চিনি ইত্যাদি।

(৫) মায়ানমার (বার্মিজ) : ফুঙ্গি, লুঙ্গি ইত্যাদি।

(৬) জাপানি : রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ : কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন – রাজা-বাদশা (তৎসম+ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি), হেড-মৌলভি (ইংরেজি+ফারসি), হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি+তৎসম) খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি+তৎসম), ডাক্তার-খানা (ইংরেজি+ফারসি), পকেট-মার (ইংরেজি+বাংলা), চৌ-হদ্দি (ফারসি+আরবি) ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এর বেশিরভাগই এ কালের প্রয়োগ।

উদাহরণ : অম্লজান–oxygen; উদযান-hydrogen; নথি-file; প্রশিক্ষণ-training; ব্যবস্থাপক-manager; বেতার-radio; মহাব্যবস্থাপক-general manager; সচিব-secretary; স্নাতক-graduate; স্নাতকোত্তর-post graduate; সমাপ্তি-final; সাময়িকী-periodical; সমীকরণ-equation ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য : বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত- যে ভাষা থেকেই আসুক না কেন, এখন তা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। এগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, বাংলা থেকে আলাদা করে এদের কথা চিন্তা করা যায় না। যেমন–টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, স্যাটেলাইট ইত্যাদি প্রচলিত শব্দের কঠিনতর বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ (= বি + আ + √কৃ + অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

সংজ্ঞা : যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা: ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও সেসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ : যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তাই বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন–

১. ধ্বনি (Sound)

২. শব্দ (Word)

৩. বাক্য (Sentence)

৪. অর্থ (Meaning)

সব ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয় –

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব ((Morphology)

৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) এবং

৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এ ছাড়া অভিধানতত্ত্ব (Lexicography) ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি : মানুষের বাক প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আল–জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলা হয়। বাক প্রত্যঙ্গাজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে (Unit) ধ্বনিমূল (Phoneme) বলা হয়।

বর্ণ : বাক প্রত্যঙ্গাজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষায়ই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। যেমন–বাংলায় 'বক' কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'ব', ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় B বা b (বি); আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় ب (বে)।

ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণত্ব ও ষত্ব বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

২. রূপতত্ত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ (morpheme)। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলা হয়।

৩. বাক্যতত্ত্ব

মানুষের বাক্‌প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে সৃষ্ট অর্থবোধক বাক প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য (Sentence)। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোন পদের পর কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

৪. অর্থতত্ত্ব

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন–মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য পণ্ডিতেরা কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রয়োজনীয় কিছু পারিভাষিক শব্দের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো :

প্রাতিপদিক : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে **প্রাতিপদিক** বলে। যেমন– হাত, বই, কলম ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : মৌলিক শব্দ ব্যতীত অন্য সব শব্দকেই **সাধিত শব্দ** বলে। যথা– হাতা, গরমিল, দম্পতি ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার : নাম শব্দ ও ক্রিয়া। প্রত্যেকটি বা নামশব্দের ও ক্রিয়ার দুটি অংশ থাকে।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়।

প্রকৃতি : যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, তাকে **প্রকৃতি বলে**।

প্রকৃতি দুই প্রকার : **নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু**।

নাম প্রকৃতি : হাতল, ফুলেল, মুখর– এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই – হাত + ল = হাতল (বাঁট), ফুল + এল = ফুলেল (ফুলজাত) এবং মুখ + র = মুখর (বাচাল)। এখানে হাত, ফুল ও মুখ শব্দগুলোকে বলা হয় প্রকৃতি বা মূল অংশ। এগুলোর **নাম প্রকৃতি**।

ক্রিয়া প্রকৃতি : আবার চলন্ত, জমা ও লিখিত– এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই √চল্+অন্ত= চলন্ত (চলমান), √জম্ + আ = জমা (সঞ্চিত) এবং √লিখ্ + ইত = লিখিত (যা লেখা হয়েছে)। এখানে চল্, জম্ ও লিখ্ – এ তিনটি ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়ার মূল অংশ। এগুলোকে বলা হয় **ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু**।

প্রত্যয় : শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে **প্রত্যয়** বলে।

কয়েকটি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

নাম প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
হাত	+ ল	হাতল
ফুল	+ এল	ফুলেল
মুখ	+ র	মুখর

ক্রিয়া প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
√চল্	+ অন্ত	চলন্ত
√জম্	+ আ	জমা

বাংলা শব্দ গঠনে দুই প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায় : **১. তদ্ধিত প্রত্যয়** ও **২. কৃৎ প্রত্যয়**।

১. তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দমূল বা নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে **তদ্ধিত** প্রত্যয়। যেমন–হাতল, ফুলেল ও মুখর শব্দের যথাক্রমে ল, এল এবং র **তদ্ধিত** প্রত্যয়।

২. কৃৎ প্রত্যয় : ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে **কৃৎ প্রত্যয়**। উদাহরণে চলন্ত, জমা ও লিখিত শব্দের যথাক্রমে অন্ত, আ এবং ইত **কৃৎ প্রত্যয়**।

তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় **তদ্ধিতান্ত শব্দ** এবং কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় **কৃদন্ত শব্দ**। যেমন– হাতল, ফুলেল ও মুখর **তদ্ধিতান্ত শব্দ** এবং চলন্ত, জমা ও লিখিত **কৃদন্ত শব্দ**।

উপসর্গ : শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে বলা হয় **উপসর্গ**।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হলেই অর্থবাচকতা সূচিত হয়। যেমন – 'পরা' একটি উপসর্গ, এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু 'জয়' শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে হলো 'পরাজয়'। এটি জয়ের বিপরীতার্থক। সেইরূপ 'দর্শন' অর্থ দেখা। এর আগে 'প্র' উপসর্গ যুক্ত হয়ে হলো 'প্রদর্শন' অর্থাৎ সম্যকরূপে দর্শন বা বিশেষভাবে দেখা।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকারের উপসর্গ দেখা যায়: **১. সংস্কৃত ২. বাংলা ৩. বিদেশি** উপসর্গ।

১. সংস্কৃত উপসর্গ : প্র, পরা, অপ–এরূপ বিশটি **সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ** রয়েছে।

তৎসম উপসর্গ তৎসম শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'পূর্ণ' একটি তৎসম শব্দ। 'পরি' উপসর্গযোগে হয় 'পরিপূর্ণ। √হৃ (হর)+ঘঞ = 'হার'–এ কৃদন্ত শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করলে কীরূপ অর্থের পরিবর্তন হলো লক্ষ কর : আ+হার = আহার (খাওয়া),বি + হার = বিহার (ভ্রমণ), উপ+হার=উপহার (পারিতোষিক), পরি+হার=পরিহার (বর্জন) ইত্যাদি।

২। **বাংলা উপসর্গ** : অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আব, নি ইত্যাদি অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ বাংলা উপসর্গ। খাঁটি বাংলা শব্দের আগে এগুলো যুক্ত হয়। যেমন – অ+কাজ=অকাজ, অনা+ছিষ্টি (সৃষ্টি শব্দজাত) = অনাছিষ্টি ইত্যাদি।

৩। **বিদেশি উপসর্গ** : কিছু বিদেশি শব্দ বা শব্দাংশ বাংলা উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বিদেশি উপসর্গ বিদেশি শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা : বেহেড, লাপাত্তা, গরহাজির ইত্যাদি।

(পরে উপসর্গ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

অনুসর্গ : বাংলা ভাষায় দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, চেয়ে, থেকে, উপরে, পরে, প্রতি, মাঝে, বই, ব্যতীত, অবধি, হেতু, জন্য, কারণ, মতো, তবে ইত্যাদি শব্দ কখনো অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে পদরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়; আবার কখনো কখনো শব্দবিভক্তির ন্যায় অন্য শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে অর্থবৈচিত্র্য ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে **অনুসর্গ** বলা হয়। যেমন–**কেবল** আমার **জন্য** তোমার এ দুর্ভোগ। মনোযোগ **দিয়ে** শোন, শেষ **পর্যন্ত** সবার কাজে আসবে।

অনুশীলনী

১। ভাষা বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

২। বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে কয়টি গুচ্ছে বিভক্ত করা যায়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩। নিচের শব্দগুলোকে গুচ্ছ অনুযায়ী সাজাও (তৎসম, তদ্ভব ইত্যাদি শিরোনামের নিচে লেখ)।

রাখাল, সম্রাট, বাদশাহ, বেগম, গুরু, গৃহ, হাকিম, দা, হাসপাতাল, চেয়ার, সমুদ্র, কিতাব, ডিঙ্গি, ঢেঁকি, চিনি, লুঙ্গি, রিক্সা, দেবতা, খড়ম।

৪। ব্যাকরণ কাকে বলে। ব্যাকরণে কী কী বিষয় আলোচিত হয়?

৫। নিচের বাক্যগুলোকে আদর্শ চলিত রীতিতে পরিবর্তন কর।

ক. এখনও সে স্কুল হইতে ফিরে নাই।

খ. আমি তাহাকে চিঠি লিখিয়াছি।

গ. সে আসিবে বলিয়া ভরসা করিতে পরিতেছি না।

ঘ. আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়া লইয়াছি।

ঙ. স্কুল পালাইয়া রবীন্দ্রনাথ হইতে পারিবে না।

চ. বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ছ. সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া যাইও না, দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিও না।

জ. যাহাদের কথামতো অগ্রসর হইলাম শেষ পর্যন্ত তাহারাই আমাকে বিপদে ফেলিল।

ঝ. দুই বন্ধু বনে ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময় এক ভালুক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে হাজির হইল।

৬। ঠিকতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

ক. বাংলা লেখ্য ভাষার রীতি কয়টি? – একটি/ দুটি/তিনটি/চারটি

খ. সাধু রীতির বাক্যবিন্যাস–অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট/ অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট/ অনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট

গ. চলিত রীতি–দুর্বোধ্য/সহজবোধ্য/বক্তৃতার অনুপযোগী

ঘ. বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? – তিন ভাগে/ পাঁচ ভাগে/ চার ভাগে

ঙ. দেশি শব্দ–সংস্কৃত জাত / তদ্ভব জাত/ দেশজ

চ. তৎসম শব্দ মানে– সংস্কৃত/ ফারসি/ উর্দু

৭। ক. নিচের শব্দগুলো থেকে ইংরেজি শব্দ খুঁজে বের কর।

কিতাব, হাকিম, আনারস, চাকর, পেন্সিল, কলম, টিন, স্কুল, শার্ট

খ. নিচের শব্দগুলো থেকে আরবি–ফারসি শব্দ খুঁজে বের কর এবং আরবি শব্দের ডানে 'আ' ও ফারসি শব্দের ডানে 'ফা' লিখে দাও।

রেস্তোরাঁ, বোতাম, দারোগা, অফিস, আদালত, কলম, দোয়াত, খোদা, নামাজ, নবি, পয়গম্বর, ফুটবল, গুদাম, বালতি, ফেরেশতা, বেহেশত, ইমান, গোসল, মক্তব, মাওলানা।

গ. নিচের শব্দগুলোর প্রতি গুচ্ছের পাশে ডান দিকে যে নাম লেখা আছে তা ভুল হলে ঠিক নামটি বসাও।

১. গুনাহ, ফেরেশতা, দোজখ, রোজা–আরবি

২. মাস্টার, লাইব্রেরি, ব্যাগ, কলেজ–ফারসি

৩. চন্দ্র, সূর্য, পত্র, ধর্ম – পর্তুগিজ

৪. চুলা, কুলা, চোঙ্গা, ডিঙ্গি–ইংরেজি

৫. হাত, চামার, কামার, মাথা – দেশি

৬. আলপিন, আলমারি, পাউরুটি, চাবি–তৎসম

৭. চাকু, চাকর, দারোগা, তোপ–তদ্ভব

৮. আল্লাহ, ইসলাম, তসবি, উকিল–তুর্কি।

৮। নিচে ব্যাকরণের দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো। যেটি ঠিক তার বাম পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. যে শাস্ত্রে ভাষার বিভিন্ন উপাদান, তার গঠনপ্রকৃতি ও তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।

২. যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভাষা শুদ্ধরূপে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বনিতত্ত্ব

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো **মৌলিক ধ্বনি** (Sound) পাই। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে।

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় : **১. স্বরধ্বনি** ও **২. ব্যঞ্জনধ্বনি**।

১. স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস–তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় **স্বরধ্বনি** (Vowel sound) । যেমন – অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস–তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় **ব্যঞ্জনধ্বনি** (Consonant sound) যেমন– ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter) ।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় **স্বরবর্ণ**। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় **ব্যঞ্জনবর্ণ**। যেমন–ক ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার **বর্ণমালা** (Alphabet) বলা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি 'অ' স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন – ক্ + অ = ক, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে 'হস্' বা 'হল' চিহ্ন (্) দিয়ে লিখিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশটি (৩৯)টি।

১. স্বরবর্ণ	:	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ	১১টি
২. ব্যঞ্জনবর্ণ	:	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
		চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি

ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি
ত থ দ ধ ন	৫টি
প ফ ব ভ ম	৫টি
য র ল	৩টি
শ ষ স হ	৪টি
ড় ঢ় য় ৎ	৪টি
ং ঃ ঁ	৩টি
	মোট ৫০টি

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ঐ, ঔ – এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন – অ+ই = ঐ, অ + উ = ঔ

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

কার ও ফলা

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

এই রূপ বা form শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত – যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় **সংক্ষিপ্ত স্বর** বা **'কার'**। যেমন – 'আ'–এর সংক্ষিপ্ত রূপ (া)। 'ম'–এর সঙ্গে 'আ'–এর সংক্ষিপ্ত রূপ ' া ' যুক্ত হয়ে হয় 'মা'। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ–কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন – আ–কার (া), ই–কার (ি), ঈ–কার (ী), উ–কার, (ু), ঊ–কার (ূ), ঋ–কার (ৃ), এ–কার (ে), ঐ–কার (ৈ), ও–কার (ে–া), ঔ–কার (ে–ৗ)। অ–এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা 'কার' নেই।

আ–কার (া) এবং ঈ–কার (ী) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই–কার (ি), এ–কার (ে) এবং ঐ–কার (ৈ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ–কার (ু), ঊ–কার (ূ) এবং ঋ–কার (ৃ) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও–কার (ে–া) এবং ঔ–কার (ে–ৗ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মূ, মৃ, মো, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। যেমন–ম্য, ম্র ইত্যাদি। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন **'কার'** বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় **'ফলা'**। এভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন– ম–এ য–ফলা = ম্য, ম– এ র–ফলা = ম্র, ম–এ ল– ফলা = ম্ল, ম–এ ব–ফলা = ম্ব। র–ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে। 'ম্র'; আবার 'র' যদি ম–এর আগে উচ্চারিত হয়, যেমন–

ম–এ রেফ 'র্ম' তবে লেখা হয় ওপরে, ব্যঞ্জনটির মাথায় রেফ (́) দিয়ে। 'ফলা' যুক্ত হলে যেমন, তেমনি 'কার' যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন – হ–এ উ–কার=হু, গ–এ উ–কার = গু, শ–এ উ–কার = শু, স–এ উ–কার=সু, র–এ উ–কার = রু, র–এ ঊ–কার = রূ, হ–এ ঋ–কার=হৃ।

ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি **স্পর্শধ্বনি** (Plosive)কে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি গুচ্ছে বা বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্গীয় ধ্বনি। বর্গভুক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্ন গুলোকেও ঐ বর্গীয় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন–

ক খ গ ঘ ঙ	ধ্বনি	হিসেবে	এগুলো	কণ্ঠ্য	ধ্বনি,	বর্ণ	হিসেবে	'ক'	বর্গীয়	বর্ণ
চ ছ জ ঝ ঞ	"	"	"	তালব্য	"	"	"	'চ'	"	"
ট ঠ ড ঢ ণ	"	"	"	মূর্ধন্য	"	"	"	'ট'	"	"
ত থ দ ধ ন	"	"	'	দন্ত্য	"	"	"	'ত'	"	"
প ফ ব ভ ম	"	"	"	ওষ্ঠ্য	"	"	"	'প'	"	"

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহবা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল, অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাৎ দন্তমূল, দন্ত বা অগ্র দন্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় : ১. কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় ২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত, ৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়, ৪. দন্ত্য বা অগ্র দন্তমূলীয় এবং ৫. ওষ্ঠ্য।
ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গ গুলো ব্যবহৃত হয় ঃ

১ – ঠোঁট (ওষ্ঠ ও অধর)

২ – দাঁতের পাটি

৩ – দন্তমূল, অগ্র দন্তমূল

৪ – অগ্রতালু, শক্ত তালু

৫ – পশ্চাত্তালু, নরম তালু, মূর্ধা

৬ – আলজিভ

৭ – জিহবাগ্র

৮ – সম্মুখ জিহবা

৯ – পশ্চাদজিহবা, জিহবামূল

১০ – নাসা–গহ্বর

১১ – স্বর–পল্লব, স্বরতন্ত্রী

১২ - ফুসফুস

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহবামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহবামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ শ য য	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

দ্রষ্টব্য : খণ্ড–ত (ৎ)–কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্–চিহ্ন যুক্ত (ত্)–এর রূপভেদ মাত্র।

ং ঃ ঁ – এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় **পরাশ্রয়ী** বর্ণ।

ঙ ঞ ণ ন ম–এ পাঁচটি বর্ণ এবং ং ঃ ঁ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে **অনুনাসিক** বা **নাসিক্য ধ্বনি**। আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় **অনুনাসিক** বা **নাসিক্য বর্ণ**।

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। যেমন– ইংরেজি full–পূর্ণ এবং fool বোকা। শব্দ দুটোর প্রথমটির উচ্চারণ হ্রস্ব ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। হ্রস্ব বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে হ্রস্ব হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন–ইলিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন–লিখিত হয়েছে হ্রস্ব ই–কার ও হ্রস্ব – উ–কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, ঈদুল ফিত্‌র, ভূমি–লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ঈ–কার এবং দীর্ঘ ঊ–কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে যাচ্ছে। একটিমাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন–দিন, তিল, পুর ইত্যাদি।

যৌগিক স্বর : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি–স্বর বলা হয়। যেমন–অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয়, (বয়, ময়না), অ + ও = অও (হও, লও)।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ।

আ + ই = আই (যাই, ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (যায়, খায়); আ + ও = আও (যাও, খাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (নিও, দিও); উ + ই = উই (উই, শুই); উ + আ = উয়া (কুয়া); এ + আ=এয়া (কেয়া, দেয়া); এ + ই = এই (সেই, নেই); এ + ও = এও (খেও); ও + ও = ওও (শোও)।

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে: ঐ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, বৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ ও উচ্চারণগত নাম

আগে আমরা দেখেছি যে, পাঁচটি বর্গ বা গুচ্ছে প্রত্যকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্পৃষ্ট ধ্বনিজ্ঞাপক। ক থেকে ম পর্যন্ত এ পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে **স্পর্শ ব্যঞ্জন** বা **স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে।

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী **স্পর্শ ব্যঞ্জন**ধ্বনিগুলোকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : **১. অঘোষ** এবং **২. ঘোষ**।

১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় **অঘোষ ধ্বনি**। যেমন– ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।

২. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলে **ঘোষ ধ্বনি**। যেমন–গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

এগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ক. **অল্পপ্রাণ** এবং খ. **মহাপ্রাণ**।

ক. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় **অল্পপ্রাণ ধ্বনি**। যেমন–ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

খ. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় **মহাপ্রাণ ধ্বনি**। যেমন–খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি : শ, ষ, স, হ – এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় **উষ্মধ্বনি** বা **শিশধ্বনি**। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় **উষ্মবর্ণ**।

শ ষ স – এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি **অঘোষ অল্পপ্রাণ**, আর **'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ** ধ্বনি।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : য্ (Y) এবং ব্ (W) এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় **অন্তঃস্থ ধ্বনি**।

ধ্বনির উচ্চারণ বিধি

স্বরধ্বনির উচ্চারণ

ই এবং **ঈ**–ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে আসে এবং উচ্চে অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌছে। **এ** ধ্বনির উচ্চারণে জিহবার অবস্থান **ই**–ধ্বনির মতো সম্মুখেই হয়, কিন্তু একটু নিচে এবং **আ**–ধ্বনির বেলায় আরও নিচে। **ই ঈ** এ (অ) ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা এগিয়ে সম্মুখভাগে দাঁতের দিকে আসে বলে এগুলোকে বলা হয় **সম্মুখ ধ্বনি**। **ই** এবং ঈ–র উচ্চারণের বেলায় জিহবা উচ্চে থাকে। তাই এগুলো **উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি**। এ **মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি** এবং **অ নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি**।

উ এবং **ঊ**–ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাৎ তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি ওঠে। ও–ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা আরও একটু নিচে আসে। অ–ধ্বনির বেলায় তার চেয়েও নিচে আসে। **উ ঊ** ও **অ**–ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা পিছিয়ে আসে বলে এগুলোকে **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** বলা হয়। **উ** ও **ঊ**–ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় **উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** ও **মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** এবং **অ–নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি**।

বাংলা আ–ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ–কে **কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি** এবং **বিবৃত ধ্বনিও** বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো

	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ ঊ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

শব্দে অবস্থানভেদে অ দুইভাবে লিখিত হয়

১. স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন–অমর, অনেক।

২. শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন– কর, বল। এখানে ক এবং র আর ব এবং ল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক্ + অ + র্ + অ; ব্+ অ + ল্ + অ)।

শব্দের অ–ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন– অমল, অনেক, কত।

২. সংবৃত বা ও–ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যথা– অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ–এর উচ্চারণ অনেকটা ও–এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।

১. ‘অ’–ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ

(ক) শব্দের আদিতে

১. শব্দের আদিতে না–বোধক ‘অ’ যেমন – অটল, অনাচার।

২. ‘অ’ কিংবা ‘আ’–যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ–ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন – অমানিশা, কথা।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত ‘অ’। যেমন – কলম, বৈধতা, যত, শ্রেয়ঃ।

২. ঋ–ধ্বনি, এ–ধ্বনি, ঐ–ধ্বনি এবং ঔ–ধ্বনির পরবর্তী ‘অ’ প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন – তৃণ, দেব, ধৈর্য, নোলক, মৌন ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় ই–ধ্বনির পরের ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন – গঠিত, মিত, জনিত ইত্যাদি।

২. অ–ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ–ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণে চোয়াল বেশি ফাঁক হয়। ঠোঁট তত বাঁকা বা গোল হয় না। কিন্তু সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোঁট গোলাকৃত হয়ে 'ও'–এর মতো উচ্চারিত হয়। সংবৃত উচ্চারণকে 'বিকৃত', 'অপ্রকৃত' বা 'অস্বাভাবিক' উচ্চারণ বলা ঠিক নয়। সংবৃত উচ্চারণও 'স্বাভাবিক', 'অবিকৃত' ও 'প্রকৃত' উচ্চারণ।

(ক) শব্দের আদিতে

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি 'অ' সংবৃত হয়। যেমন– অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ), করে (অসমাপিকা 'কোরে')। কিন্তু সমাপিকা 'করে' শব্দের 'অ' বিবৃত।

২. পরবর্তী ই, উ – ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র–ফলাযুক্ত 'অ' সংবৃত হয়। যেমন – প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব 'অ' বিবৃত হয়। যেমন–প্রভাত, প্রত্যয়, প্রণাম ইত্যাদি।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশ্লেষণ পদের অন্ত্য স্বর 'অ' সংবৃত হয়। যেমন – প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।

২. ই, উ–এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য 'অ' সংবৃত। যেমন – পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো) ইত্যাদি।

আ : বাংলায় আ–ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু–ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের আ (a)–এর মতো। যেমন– আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি।

বাংলায় **একাক্ষর** (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন– কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ হ্রস্ব। এরূপ– যা, পান, ধান, সাজ, চাল, চাঁদ, বাঁশ।

ই ঈ : বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই–ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ–ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ – দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন– বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।

উ **ঊ** : বাংলায় উ এবং ঊ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই ঈ–ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষর–বিশিষ্ট শব্দের বদ্ধাক্ষরে বা প্রান্তিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন– চুল (দীর্ঘ), চুলা (হ্রস্ব), ভূত, মুক্ত, তুলতুলে, তুফান, বহু, অজু, করুণ।

ঋ : স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ–এর উচ্চারণ রি অথবা রী–এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র–ফলা+ ই–কার এর মতো হয়। যেমন– ঋণ, ঋতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিষ্টি)।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় ঋ–ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে।

এ : এ–ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম : সংবৃত ও বিবৃত। যেমন – মেঘ, সংবৃত/বিবৃত, খেলা–(খ্যালা), বিবৃত।

১. সংবৃত

ক) পদের অন্তে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন– পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।

খ) তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ–ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন– দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন– কে, সে, যে।

ঘ) ‘হ’ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন– দেহ, কেহ, কেষ্ট।

ঙ) ‘ই’ বা ‘উ’–কার পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন – দেখি, রেণু, বেলুন।

২. বিবৃত : ‘এ’ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)–এর ‘এ’ (a)–এর মতো। যেমন– দেখ (দ্যাখ), একা (এ্যাকা) ইত্যাদি।

এ– ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে– যেমন : এত, হেন, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম– যেথা, সেথা, হেথা।

খ) অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের এ–ধ্বনি বিবৃত। যেমন–খেংড়া, চেংড়া, স্যাঁতসেঁতে, গেঁজেল।

গ) খাঁটি বাংলা শব্দে : যেমন– খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

ঘ) এক, এগার, তের – এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, ‘এক’ যুক্ত শব্দেও : যেমন– একচোট, একতলা, একঘরে ইত্যাদি।

ঙ) ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপে; যেমন– দেখ্ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল্ (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল্ (ফ্যাল্), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

ঐ : এ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই কিংবা ও + ই = অই, ওই। অ এবং ই– এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ–ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন – ক্ + অ + ই = কই, কৈ; ব্ + ই + ধ = বৈধ ইত্যাদি। এরূপ – বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও–কার দীর্ঘ হয়। যেমন– গো, জোর, রোগ, ভোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব হয়। যেমন– সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও–এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)–এর মতো।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

ক–বর্গীয় ধ্বনি : ক খ গ ঘ ঙ– এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো **জিহ্বামূলীয়** বা **কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি**।

চ–বর্গীয় ধ্বনি : চ ছ জ ঝ ঞ–এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় **তালব্য স্পর্শধ্বনি**।

ট–বর্গীয় ধ্বনি : ট ঠ ড ঢ ণ – এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম **দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি**। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় **মূর্ধন্য ধ্বনি**।

ত–বর্গীয় ধ্বনি : ত থ দ ধ ন– এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় **দন্ত্য ধ্বনি**।

প–বর্গীয় ধ্বনি : প ফ ব ভ ম – এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের **ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে**।

জ্ঞাতব্য

(১) ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগযন্ত্রের কোনো কোনো অংশের কিংবা ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে; অর্থাৎ এদের উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের কোথাও না কোথাও ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে বলে স্পর্শ ধ্বনি।

(২) ঙ ঞ ণ ন ম – এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস–তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় **নাসিক্য ধ্বনি** এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় **নাসিক্য বর্ণ**।

(৩) ঁ চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে **অনুনাসিক ধ্বনি** এবং প্রতীকটিকে **অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ** বলে। যেমন– আঁকা, চাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শাঁস ইত্যাদি।

(৪) বাংলায় ঙ এবং ং বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমন–রঙ / রং, অহংকার / অহঙ্কার ইত্যাদি।

(৫) ঞ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা 'ইয়'–এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো। যেমন – ভূঞা (ভুঁইয়া)।

(৬) চ–বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে ঞ–এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন – জঞ্জাল, খঞ্জ ইত্যাদি।

(৭) বাংলায় ণ এবং ন–বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট–বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ণ–এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন – ঘণ্টা, লণ্ঠন ইত্যাদি।

(৮) ঙ ং ঞ ণ – এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না, শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এসব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন– সঙ্ঘ বা সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, ভূঞা, ক্ষণ ইত্যাদি।

(৯) ন–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন– নাম, বানান, বন ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণরীতির দিক থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated)। যেমন–ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated)। যেমন– খ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced)। যেমন– ক, খ ইত্যাদি।

ঘোষ ধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি (Voiced) হয়। যেমন– গ, ঘ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হলো–

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(২) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৩) অল্পপ্রাণ (Unaspirated)	(৪) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৫) নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে য র ল ব–এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

য : য–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বাংলায় এর উচ্চারণ 'জ'–এর মতো। যেমন – যখন, যাবেন, যুদ্ধ, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে 'য়' উচ্চারিত হয়। যেমন – বি + যোগ = বিয়োগ।

র : র–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তদ্দারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়। উদাহরণ – রাহাত, আরাম, বাজার ইত্যাদি।

ল : ল–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন – লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।

ব : বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয়–ব এবং অন্তঃস্থ–ব–এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ–এ দুই রকমের ব–এর লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল, উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে অন্তঃস্থ–ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তস্থ 'য' ও অন্তঃস্থ 'ব'– এ দুটো অর্ধস্বর (Semivowel)। প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)–র মতো। যেমন – নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।

উষ্মধ্বনি : যে ব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটি **উষ্মধ্বনি**। যেমন– আশীষ, শিশি, শিশু ইত্যাদি। শিশ দেয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে বলে একে **শিশধ্বনিও** বলা হয়।

শ, ষ, স – তিনটি উষ্ম বর্ণ। শ–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পশ্চাৎ দন্তমূল। ষ–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং স–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান দন্ত।

লক্ষণীয় : স–এর সঙ্গে খ র ত থ কিংবা ন যুক্ত হলে স–এর দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যেমন – স্খলন, স্রষ্টা, আস্ত, স্থাপন, স্নেহ ইত্যাদি। আবার বানানে (লেখায়) শ থাকলেও উচ্চারণ দন্ত্য–স হয়। যেমন – শ্রমিক (স্রমিক), শৃঙ্খল (সৃঙ্খল), প্রশ্ন (প্রস্ন)।

অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্যধ্বনি (ট ও ঠ)–এর আগে এলে স–এর উচ্চারণ মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন– কষ্ট, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

হ : হ–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন মূল উষ্ম ঘোষধ্বনি। এ উষ্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্মুক্ত কণ্ঠের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন – হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

ং (অনুস্বার) : ং এর উচ্চারণ ঙ –এর উচ্চারণের মতো। যেমন – রং (রঙ), বাংলা (বাঙলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ং–এর বদলে ঙ এবং ঙ–এর বদলে ং–এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।

ঃ (বিসর্গ) : বিসর্গ হলো অঘোষ 'হ'–এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ–এর উচ্চারণ ঘোষ, কিন্তু ঃ এর উচ্চারণ অঘোষ। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়াদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যথা– আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যেমন – বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন – দুঃখ (দুখ্খ), প্রাতঃকাল (প্রাতক্কাল)।

ড় ও ঢ় : ড় ও ঢ়–বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় **তাড়নজাত ধ্বনি**। ড়–এর উচ্চারণ ড এবং র–এর দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢ়–এর উচ্চারণ ড় এবং হ–এর দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমন – বড়, গাঢ়, রাঢ়, ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়। এরূপ যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে **সংযুক্ত বর্ণ** (ligature) গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন – তক্তা (ত্ + অ + ক্ + ত্ + আ = তক্তা)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত–এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হতে পারে। যথা :

ক. কার সহযোগে

খ. ফলা সহযোগে

গ. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে ঃ স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'কার'। অ–ভিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে ঃ

আ–কার (া) – বাবা, মা, চাকা; ঋ–কার (ৃ) কৃতী, গৃহ, ঘৃত;

ই–কার (ি) – পাখি, বাড়ি, চিনি; এ–কার (ে) ছেলে, মেয়ে, ধেয়ে;

ঈ–কার (ী) – নীতি, শীত, স্ত্রী; ঐ–কার (ৈ) বৈশাখ, চৈত্র, ধৈর্য;

উ–কার (ু) – খুকু, বুবু, ফুফু; ও–কার (ো) দোলা, তোতা, খোকা;

ঊ–কার (ূ) – মূল্য, চূর্ণ, পূজা; ঔ–কার (ৌ) পৌষ, গৌতম, কৌতুক।

খ.১. ফলা সহযোগে : ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন–

ণ/ ন–ফলা (ণ/ ণ/ ন)– চিহ্ন, রত্ন, পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। চিহ্ন–র ন এবং কৃষ্ণ–র ণ

ব– ফলা (ব)– বিশ্বাস, নিঃস্ব, নিতম্ব।

ম– ফলা (ম)– তন্ময়, পদ্ম, আত্মা।

য– ফলা (্য) – সহ্য, অত্যন্ত, বিদ্যা।

র– ফলা (্র)– গ্রহ, ব্রত, স্রষ্টা।

(র্ রেফ) – বর্ণ, স্বর্ণ, তর্ক, খর্ব।

ল– ফলা (ল)– ক্লান্ত, অম্লান, উল্লাস ।

খ. ২. বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যথা– এ্যাপোলো, এ্যাটম, অ্যাটর্নি, অ্যালার্ম ধ্বনি ইত্যাদি।

খ. ৩. বাংলা যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন – সন্ন্যাস, সূক্ষ্ম, রুক্মিণী, সন্ধ্যা, ইত্যাদি।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ।

দুই বর্ণের যুক্ত:

ক্ক =ক্+ক। যেমন– পাক্কা, ছক্কা, চক্কর।

ক্ত = ক্+ত। যেমন– রক্ত, শক্ত, ভক্ত।

ক্ষ= ক্+ষ। (উচ্চারণ ক্ +খ–এর মতো) যেমন– শিক্ষা, বক্ষ, রক্ষা।

ক্স= ক্+স। বাক্স।

ঙ্ক= ঙ+ক। যেমন– অঙ্ক, কঙ্কাল, লঙ্কা।

ঙ্খ= ঙ+খ। যেমন– শৃঙ্খলা, শঙ্খ।

ঙ্গ= ঙ+গ। যেমন– অঙ্গ, মঙ্গল, সঙ্গীত।

ঙ্ঘ= ঙ+ঘ। যেমন– সঙ্ঘ, লঙ্ঘন।

চ্চ= চ্ +চ। যেমন– উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চকিত।

চ্ছ= চ্+ছ। যেমন– উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছেদ ।

জ্জ= জ্+জ। যেমন– উজ্জীবন, উজ্জীবিত।

জ্ঝ= জ্+ঝ। যেমন– কুজ্ঝটিকা।

জ্ঞ= জ্ +ঞ। যেমন– উচ্চারণ 'গ্গ্যঁ'– এর মতো) যেমন– জ্ঞান, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান।

ঞ্চ (ঞ্চ)= ঞ্ +চ। যেমন– অঞ্চল, সঞ্চয়, পঞ্চম।

ঞ্ছ= ঞ্ +ছ। যেমন–বাঞ্ছিত, বাঞ্ছনীয়, বাঞ্ছা।

ঞ্জ= ঞ্ +জ। যেমন– গঞ্জ, রঞ্জন, কুঞ্জ।

ঞ্ঝ = ঞ্+ঝ। যেমন– ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট।

[বি. দ্র. উপর্যুক্ত চারটি সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ 'ন' হলে ও লেখার সময় কখনো ন্চ (অন্চল), ন্ ছ (বান্ছা), ন্জ (গন্জ), নঝ (ঝন্ঝা) রূপে লেখা ঠিক নয়।]

ট্ট= ট্ +ট। যেমন– অট্টালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।
ড্ড= ড্ +ড। যেমন– গড্ডালিকা, উড্ডীন, উড্ডয়ন।
ণ্ট= ণ্+ট। যেমন– ঘণ্টা, বণ্টন।
ত্ত= ত্ +ত। যেমন– উত্তম, বিত্ত, চিত্ত।
ত্থ= ত্+থ। যেমন–উত্থান, উত্থিত, অভ্যুত্থান।
দ্দ= দ্ +দ। যেমন–উদ্দাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য।
দ্ধ= দ্ +ধ। যেমন– উদ্ধত, উদ্ধৃত, পদ্ধতি।
দ্ভ= দ্ +ভ। যেমন– উদ্ভব, উদ্ভট, উদ্ভিদ।
ন্ত= ন্+ত। যেমন– অন্ত, দন্ত, কান্ত।
ন্দ= ন্+দ। যেমন– আনন্দ, সন্দেশ, বন্দী।
ন্ধ= ন্+ধ। যেমন– বন্ধন, রন্ধন, সন্ধান।
ন্ন= ন্ +ন। যেমন– অন্ন, ছিন্ন, ভিন্ন।
ন্ম= ন্ +ম। যেমন– জন্ম, আজন্ম।
প্ত= প্ +ত। যেমন– রপ্ত, ব্যাপ্ত, লিপ্ত।
প্প= প্ +প। যেমন– পাপ্পা, পাপ্পু, ধাপ্পা।
প্স= প্ +স। যেমন– লিপ্সা, অভীপ্সা।
ব্দ= ব্ +দ। যেমন–অব্দ, জব্দ, শব্দ।
ল্ক= ল্ +ক। যেমন– উল্কা, বল্কল।
ল্গ= ল্ +গ। যেমন– ফাল্গুন।
ল্ট= ল্ +ট। যেমন– উল্টা।
ষ্ক= ষ্ +ক। যেমন– শুষ্ক, পরিষ্কার, বহিষ্কার।
স্ক= স্ +ক। যেমন– স্কুল, স্কন্ধ।
স্খ= স্ +খ। যেমন– স্খলন।
স্ট= স+ট। যেমন– আগস্ট, স্টেশন।
স্ত= স্ +ত। যেমন– অস্ত, সস্তা, স্তব্ধ।
স্প= স্ +প। যেমন–স্পষ্ট, স্পন্দন, স্পর্ধা।
স্ফ= স্ +ফ। যেমন– স্ফটিক, প্রস্ফুটিত।
হ্ম= হ্ +ম। যেমন– ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ।

এছাড়া বাংলা ভাষায় দুইয়ের অধিক বর্ণ সংযোগেও কিছু সংযুক্ত বর্ণ গঠিত হয়। সূক্ষ্ম শব্দে ক্ষ্ম বর্ণ= ক্ +ষ+ম– ফলা ; স্বাতন্ত্র্য শব্দের ন্ত্র্য=ন+ত+র–ফলা (্র) +য–ফলা (্য) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধ্বনির পরিবর্তন

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. আদি স্বরাগম (Prothesis) : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম (Prothesis)। যেমন – স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন। এরূপ – আস্তাবল, আস্পর্ধা।

২. মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন–

অ – রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।

ই – প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।

উ – মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রূ > ভুরু ইত্যাদি।

এ – গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।

ও – শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis) : কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে।এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমন– দিশ্ > দিশা, পোখত্ > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিতি (Apenthesis) : পরের ই–কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই–কার বা উ–কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন – আজি > আইজ, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর ইত্যাদি।

৫. অসমীকরণ (Dissimilation) : একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ। যেমন – ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ ইত্যাদি।

৬. স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony) : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন – দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. প্রগত (Progressive) : আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন – মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

খ. পরাগত (Regressive) : অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

গ. **মধ্যগত (Mutual)** : আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন– বিলাতি > বিলিতি।

ঘ. **অন্যোন্য (Reciprocal)** : আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন – মোজা > মুজো।

ঙ. **চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি** : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ–কার হলে পরবর্তী স্বর ও–কার হয়। যেমন – মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে –উড়ুনি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয়।

৭. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন – বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

ক. **আদিস্বরলোপ (Aphesis)** : যেমন– অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার।

খ. **মধ্যস্বর লোপ (Syncope)** : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

গ. **অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope)** : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সন্ধ্যা > সঞ্‌ঝা > সাঁঝ। (স্বরলোপ বস্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।)

৮. ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন – ইংরেজি বাক্‌স > বাংলা বাস্‌ক, জাপানি রিক্‌সা > বাংলা রিস্‌কা ইত্যাদি। অনুরূপ – পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল।

৯. সমীভবন (Assimilation) : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প–বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন– জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. প্রগত (Progressive) সমীভবন : পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমন – চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্‌গ ইত্যাদি।

খ. পরাগত (Regressive) সমীভবন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীভবন। যেমন– তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ ইত্যাদি।

গ. অন্যোন্য (Mutual) সমীভবন : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন। যেমন– সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ। সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

১০. বিষমীভবন (Dissimilation) : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন– শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।

১১. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long Consonant) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বা। যেমন – পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দ–মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন– কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচ্যুতি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমন– বউদিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন– ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

১৫. অভিশ্রুতি (Umlaut) : বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমন– করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে'। এরূপ – শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

১৬. র–কার লোপ : আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র–কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন – তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

১৭. হ–কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ–কারের লোপ হয়। যেমন– পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আরবি আল্লাহ্ > বাংলা আল্লা, ফারসি শাহ্ > বাংলা শা ইত্যাদি।

য়–শ্রুতি ও ব–শ্রুতি (Euphonic glides) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি–স্বর (যৌগিক স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (Y) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়–শ্রুতি ও ব–শ্রুতি। যেমন – মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ – নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণসহযোগে এদের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

২। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?

৩। দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা যৌগিক স্বরগুলোর গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর।

৪। উদাহরণসহ নিচের বর্ণগুলোর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

ঙ, ঞ, ণ, ন, শ, ষ, স, ং, ঃ, ঢ়।

৫। নিচের শব্দগুলোর ঠিক উচ্চারণ পাশে লিখে দাও।

দ্বিতীয়, আত্মীয়, অবজ্ঞা, বিশ্ব, বিস্ময়, সত্য, সহ্য।

(নমুনা : ঝঞ্ঝা – ঝনঝা, কণ্টক– কণটক)।

৬। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও : সমীভবন, বিপ্রকর্ষ, স্বরসঙ্গতি, অন্তর্হতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি।

৭। ধ্বনি পরিবর্তনের যে যে বিধানে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ গঠিত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।

কপাট, জেলে, বৌদি, আলাদা।

৮। বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক সূত্রটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(অপিনিহিতি, ধ্বনি–বিপর্যয়, স্বরধ্বনি লোপ, স্বরাগম, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, অসমীকরণ, বর্ণদ্বিতা)

(ক) একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য 'আ' যুক্ত হলে তাকে বলে......।

(খ) শব্দের মধ্যে ই বা উ যথাস্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে......বলে।

(গ) শব্দের মধ্যে দুটি সমধ্বনির একটি লোপ হলে তাকে বলে......।

(ঘ) জোর দেয়ার জন্য যখন শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় তখন তাকে......বলা হয়।

(ঙ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে......বলে।

৯। নিচের বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির নাম ডান পার্শ্বে লেখ (যেমন– ঘোষ, মহাপ্রাণ, কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন)।

ব, শ, ম, দ, খ, প, ঠ, হ, ক্ষ

১০। ঠিক উত্তরে টিক (√) দাও।

ট – কণ্ঠ্যবর্ণ, ম – ওষ্ঠ্যবর্ণ, গ – ঘোষবর্ণ, চ – দন্ত্যবর্ণ, ঘ – অল্পপ্রাণ কণ্ঠ্যবর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

১. ণত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য–ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য–ণ এবং দন্ত্য–ন–এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ণ–এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

ণ ব্যবহারের নিয়ম

১. ট–বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন– ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।

২. ঋ, র, ষ – এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন– ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, ভীষণ, ভাষণ, উষ্ণ ইত্যাদি।

৩. ঋ, র, ষ–এর পরে স্বরধ্বনি, ষ য় ব হ ং এবং ক–বর্গীয় ও প–বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন – কৃপণ (ঋ–কারের পরে প্, তার পরে ণ), হরিণ (র–এর পরে ই, তার পরে ণ, অর্পণ (র্ + প্ + অ+ণ্), লক্ষণ (ক্ + ষ্ + অ + ণ্)। এরূপ – রুক্মিণী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৪. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ–ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন – ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম, দুর্নিবার, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক। ত–বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন – অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

২. ষ–ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য–ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য–ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ–এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে 'ষ' রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'–এর ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব বিধান বলে।

ষ ব্যবহারের নিয়ম

১. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র–এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন– ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই +) এখানে ব–এর পরে ই–এর ব্যবধান), মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।

২. ই–কারান্ত এবং উ–কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন – অভিসেক > অভিষেক, সুসুপ্ত > সুষুপ্ত, অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।

৩. 'ঋ' কারের পর 'ষ' হয়। যেমন– ঋষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।

৪. তৎসম শব্দে 'র'–এর পর 'ষ' হয়। যেমন– বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।

৫. র– ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়। যথা : পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা পুরস্কার।

৬. ট–বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়। যথা : কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদি।

৭. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন–ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, ঊষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। যেমন– জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন– অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। সমাসবদ্ধ পদে ণত্ব বিধানের নিয়ম খাটে না, এমন পাঁচটি উদাহরণ দাও।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ট, ঠ, ড এবং ঢ বর্ণের পূর্বে 'ন' যুক্ত হলে সর্বদাই ণ হয়।

যেমন................(৫টি)

(খ) অ, আ ভিন্ন স্বরধ্বনি এবং ক ও র–এর পরে প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।

যেমন.................(৫টি)

(গ) বিদেশি ও দেশি শব্দের বানানে ষ হয় না।

যেমন.................(৫টি)

৪। নিচের শব্দগুলো শুদ্ধ করে লেখ :

লবন, নশ্‌ট, পুরষ্কার, সুসম, আনুসজ্ঞিক, স্টেশন, পোষাক, জার্মাণ, কুরআণ, দুর্ণাম।

৫। যে বানানটি ঠিক তার নিচে দাগ দাও :

(ক) কৃপণ, তৃন, ঘন্টা, বর্ণ, হরিন, লাবণ্য, কনিকা, বণিক, কৃশক, উৎকৃষ্ট, কাষ্ঠ, শুশমা, অনুসজ্ঞা, বিষ, সরিষা, পোষ্ট।

(খ)

আষার / আষাঢ় / আশাঢ়	কণিকা / কনিকা
পাশান্ড / পাষণ্ড, পাসন্ড	লবণ / লবন
তোষণ / তোশন / তোসণ	দর্পন / দর্পণ
প্রতিষ্ঠান / প্রতিষ্ঠাণ / প্রতিস্থান	কল্যাণ / কল্যান
মিলন / মিলণ	গুণী / গুনী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সন্ধি

সংজ্ঞা

সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। যেমন– আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (া) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (া) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে =তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্ম হয়েছে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

(ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং (খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন। যেমন– 'আশা' ও 'অতীত' উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, 'আশাতীত' তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ 'হিম আলয়' বলতে যেরূপ শোনা যায়, 'হিমালয়' তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শ্রুতিমধুর। তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি–মাধুর্য রক্ষিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন– কচু + আদা + আলু =কচ্চাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচ্চাল্বাদা হয় না।

আমরা প্রথমে খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি ও পরে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করব। উল্লেখ্য, তৎসম সন্ধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা সন্ধি দুই রকমের : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

১. সন্ধিতে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন–

(ক) অ + এ = এ (অ লোপ), যেমন – শত + এক = শতেক। এরূপ – কতেক।

(খ) আ + আ = আ (একটি আ লোপ)। যেমন – শাঁখা + আরি = শাঁখারি। এরূপ – রূপা + আলি = রূপালি।

(গ) আ + উ = উ (আ লোপ)। যেমন – মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। এরূপ – হিংসুক, নিন্দুক ইত্যাদি।

(ঘ) ই + এ = ই (এ লোপ)। যেমন – কুড়ি + এক = কুড়িক। এরূপ – ধনিক, গুটিক ইত্যাদি। আশি + এর = আশির (এ লোপ)। এরূপ – নদীর (নদী +এর)।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন – যা + ইচ্ছা + তাই =যাচ্ছেতাই। এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে।

২। ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সমীভবন (Assimilation)–এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন – ছোট + দা =ছোড়দা।

২. হলন্ত র্ (বন্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন– আর্ + না = আন্না, চার + টি = চাট্টি, ধর্ + না =ধন্না, দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই ইত্যাদি।

৩. চ–বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত–বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত–বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ–বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ ত–বর্গীয় ধ্বনি ও চ–বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন– নাত + জামাই =নাজ্‌জামাই (ত্ + জ্ = জ্জ), বদ্ + জাত =বজ্জাত, হাত + ছানি = হাচ্ছানি ইত্যাদি।

৪. ‘প’–এর পরে ‘চ’ এবং ‘স’–এর পরে ‘ত’ এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন – পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ। সাত + শ = সাশ্‌শ, পাঁচ + সিকা = পাঁশ্‌শিকা।

৫. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন – বোন + আই =বোনাই, চুন + আরি =চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক =বারেক, তিন + এক =তিনেক।

৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন – কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ =নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার : (১) স্বরসন্ধি (২) ব্যঞ্জন সন্ধি (৩) বিসর্গ সন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ–কার কিংবা আ–কারের পর অ–কার কিংবা আ–কার থাকলে উভয়ে মিলে আ–কার হয়, আ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + অ = আ নর+ অধম = নরাধম। এরূপ-হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ হিম + আলয় = হিমালয়। এরূপ - দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ যথা + অর্থ = যথার্থ। এরূপ – আশাতীত, কথামৃত, মহার্ঘ ইত্যাদি।

আ + আ = আ বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ– কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ই = এ শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।

আ + ই = এ যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।

অ + ঈ = এ পরম + ঈশ =পরমেশ।

আ + ঈ = এ মহা + ঈশ =মহেশ।

এরূপ –পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ = ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।

আ + উ = ও যথা + উচিত = যথোচিত।

অ + ঊ = ও গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব।

আ + ঊ = ও গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

এরূপ – নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর' হয় এবং তা রেফ (́) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষি = দেবর্ষি।

আ + ঋ = অর্ মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এরূপ – অধমর্ণ, উত্তমর্ণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত'-শব্দ থাকলে (অ, আ+ঋ) উভয় মিলে 'আর' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন–

অ + ঋ = আর শীত + ঋত = শীতার্ত।

আ + ঋ = আর তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

এরূপ –ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ জন + এক = জনৈক।

আ + এ = ঐ সদা + এব = সদৈব।

অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য।

আ + ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ– হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি।

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি।

অ + ঔ = ঔ পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।

আ + ঔ = ঔ মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ অতি + ইত = অতীত

ই + ঈ = ঈ পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।

ঈ + ই = ঈ সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।

ঈ + ঈ = ঈ সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ– গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথ্বীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' বা য(্য) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়। যেমন–

ই + অ = য্ + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত।

ই + আ = য্ + আ ইতি + আদি = ইত্যাদি।

ই + উ = য্ + উ অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।

ই + ঊ = য্ + ঊ প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ।

ঈ + আ = য্ + আ মসী + আধার = মস্যাধার।

ই + এ = য্ + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ঈ + অ = য্ + অ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু।

এরূপ–প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়; ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ মরু + উদ্যান = মরূদ্যান।

উ + ঊ = ঊ বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব।

ঊ + উ = ঊ বধূ + উৎসব = বধূৎসব।

ঊ + ঊ = ঊ ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার ও ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন–

উ + অ = ব + অ	সু + অল্প = স্বল্প।
উ + আ = ব + আ	সু + আগত = স্বাগত।
উ + ই = ব + ই	অনু + ইত = অন্বিত।
উ + ঈ = ব + ঈ	তনু + ঈ = তন্বী।
উ + এ = ব + এ	অনু + এষণ = অন্বেষণ।

এরূপ– পশ্বধম, পশ্বাচার, অন্বয়, মন্বন্তর ইত্যাদি।

১২. ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র' হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন - পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, ও, ঔ–কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন–

এ + অ = অয়্ + অ	নে + অন = নয়ন। শে + অন = শয়ন।
ঐ + অ = আয়্ + অ	নৈ + অক = নায়ক। গৈ + অক = গায়ক।
ও + অ = অব্ + অ	পো + অন = পবন। লো + অন = লবণ।
ঔ + অ = আব্ + অ	পৌ + অক = পাবক।
ও + আ = অব্ + আ	গো + আদি = গবাদি।
ও + এ = অব্ + এ	গো + এষণা = গবেষণা।
ও + ই = অব্ + ই	পো + ইত্র = পবিত্র।
ঔ + ই = আব্ + ই	নৌ + ইক = নাবিক।
ঔ + উ = আব্ + উ	ভৌ + উক = ভাবুক।

১৪. কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিন্ধ বলে। যথা – কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়), গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়), প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়), অন্য + অন্য = অন্যান্য, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরে–ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে–স্বরে ও ব্যঞ্জনে–ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। এদিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত্, প্-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়্), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

ক্ + অ = গ — দিক্ + অন্ত =দিগন্ত।

চ্ + অ = জ — ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত।

ট্ + আ = ড় — ষট্ + আনন = ষড়ানন।

ত্ + অ = দ — তৎ + অবধি = তদবধি।

প্ + অ = ব — সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়। যথা–

অ + ছ = চ্ছ — এক + ছত্র = একচ্ছত্র।

আ + ছ = চ্ছ — কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।

ই + ছ = চ্ছ — পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

এরূপ – মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(ক) ১. ত্ ও দ্–এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ — সৎ + চিন্তা =সচ্চিন্তা।

ত্ + ছ = চ্ছ — উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

দ্ + চ = চ্চ — বিপদ + চয় = বিপচ্চয়।

দ্ + ছ = চ্ছ — বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

এরূপ – উচ্চারণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি।

২. ত্ ও দ্–এরপর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্–এর স্থানে জ্ হয়। যেমন–

ত্ + জ = জ্জ — সৎ + জন = সজ্জন।

দ্ + জ = জ্জ — বিপদ + জাল =বিপজ্জাল।

ত্ + ঝ = জ্ঝ — কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

এরূপ – উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

৩. ত্ ও দ্-এরপর শ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে চ্ এবং শ্-এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস

এরূপ – চলচ্ছক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

৪. ত্ ও দ্–এর পর ড্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড্ হয়। যেমন–

ত্ + ড = ড্ড উৎ + ডীন = উড্ডীন।

এরূপ – বৃহড্ঢক্কা।

৫. ত্ ও দ্ এর পর হ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থলে দ এবং হ এর স্থলে ধ্ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার।

দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ পদ্ + হতি = পদ্ধতি।

এরূপ – উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

৬. ত্ ও দ্ এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস।

এরূপ – উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লঙ্ঘন ইত্যাদি।

(খ) ১. ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য > জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা :

ক্ + দ = গ্ + দ বাক্ + দান = বাগদান।

ট্ + য = ড্ + য ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।

ত্ + ঘ = দ্ + ঘ উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন।

ত্ + য = দ্ + য উৎ + যোগ = উদ্যোগ।

ত্ + ব = দ্ + ব উৎ +বন্ধন = উদ্বন্ধন।

ত্ + র = দ্ + র তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

এরূপ -দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্ভব, বাগ্জাল, সদ্গুরু, বাগ্দেবী ইত্যাদি।

২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিক্যধ্বনি হয়। যথা :

ক্ + ন = গঙ + ন দিক্ + নির্ণয় = দিগ্নির্ণয় বা দিঙ্নির্ণয়।

ত্ + ম = দ/ন+ ম তৎ + মধ্যে = তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব, হ–এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন–

নিঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি।

এরূপ – নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লোভ, দুরন্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন – নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন–

ঃ + চ / ছ = শ + চ / ছ — নিঃ + চয় = নিশ্চয়, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ।

ঃ + ট / ঠ = ষ + ট / ঠ — ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।

ঃ + ত / থ = স + ত / থ — দুঃ + তর = দুস্তর, দুঃ + থ = দুস্থ।

৫. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স্) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ্ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন–

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক — নমঃ + কার = নমস্কার।

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ — পদঃ + খলন = পদস্খলন।

ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক — নিঃ + কর = নিষকর।

উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক — দুঃ + কর = দুষকর।

এরূপ – পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, নিষ্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন–

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন–

নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ। দুঃ +স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ। নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর, অহঃ + নিশ = অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। সন্ধি বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

২। সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।

৩। নিচের সূত্রগুলো অনুসরণে তিনটি করে উদাহরণ দাও।

(ক) মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

(খ) চ্ ও জ্–এর পরে নাসিক্যধ্বনি তালব্য ঞ হয়।

(গ) অ–কার ভিন্ন অন্য স্বর পরে থাকলে বিসর্গের স্থলে র হয়।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর

উদ্ধত, বনস্পতি, বারেক, আদ্যন্ত, সম্রাট, ভবন, নয়ন, উজ্জ্বল, অন্বেষণ, সন্তান, নীরোগ, প্রাতরাশ

৫। সন্ধি কর

অভি + উদয়, নিঃ + চিহ্ন, চলৎ +শক্তি, যাবৎ + জীবন, ষষ্ + থ, চিৎ + ময়, খানি + এক, অতঃ + এব, দিক্ +মণ্ডল।

৬। কোনটি শুদ্ধ নির্দেশ কর

ক. স্বরে স্বরে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে / স্বরে আর ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে/ ব্যঞ্জনে আর স্বরে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

খ. ব্যঞ্জন সন্ধি এক / দুই/ তিন রকমের।

গ. স্বরসন্ধি ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনে হয় / স্বরে স্বরে হয়।

লক্ষণীয় : এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত। যেমন – বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি। এরূপ–উন্নয়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম্ এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন–

ম্ + ক্ = ঙ + ক্ শম্ + কা =শঙ্কা।

ম্ + চ্ = ঞ + চ্ সম্ + চয় = সঞ্চয়।

ম্ + ত্ = ন্ + ত্ সম্ + তাপ = সন্তাপ।

এরূপ – কিম্ভূত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ন্যাস ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলায় ম্-এর পর কণ্ঠ্য-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ স্থানে প্রায়ই ঙ না হয়ে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন– সম্ + গত = সংগত, অহম্ + কার = অহংকার, সম্ + খ্যা = সংখ্যা।

এরূপ – সংকীর্ণ, সংগীত, সংগঠন, সংঘাত ইত্যাদি।

৪. ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন–

সম্ + যম = সংযম, সম্ + বাদ = সংবাদ, সম্+ রক্ষণ = সংরক্ষণ,

সম্ + লাপ = সংলাপ সম্ + শয় = সংশয় সম্ + সার = সংসার,

সম্ + হার = সংহার।

এরূপ– বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বংসহা, স্বয়ংবরা। ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)।

৫. চ্ ও জ্–এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন –

চ্ + ন = চ্ + ঞ, যাচ্ + না = যাচ্ঞা, রাজ্ + নী =রাজ্ঞী।

জ্ + ন = জ্ + ঞ, যজ্ + ন = যজ্ঞ,

৬. দ্ ও ধ্ এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

দ্ > ত্ তদ্ + কাল = তৎকাল

ধ্ > ত্ ক্ষুধ্ + পিপাসা =ক্ষুৎপিপাসা।

এরূপ – হৃৎকম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

৭. দ্ কিংবা ধ্–এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। যেমন–

বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ – তৎসম।

৮. ষ্-এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন–

কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ।

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি

উৎ + স্থান = উত্থান সম্ + কার = সংস্কার, উৎ + স্থাপন = উত্থাপন,

সম্ + কৃত = সংস্কৃত, পরি + কার = পরিষ্কার।

এরূপ - সংস্কৃতি, পরিষ্কৃত ইত্যাদি।

১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়

আ+ চর্য = আশ্চর্য, গো + পদ = গোষ্পদ, বন্ + পতি = বনস্পতি

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, পর্ + পর = পরস্পর,

মনস্ + ঈষা = মনীষা, ষট্ + দশ = ষোড়শ এক্ + দশ =একাদশ,

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।

৩. বিসর্গ সন্ধি

সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত র্ ও স্ অনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উষ্মধ্বনি অর্থাৎ হ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ(ঃ) রূপে লেখা হয়। র্ ও স্ বিসর্গ ব্যঞ্জনধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্–এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. র্ – জাত বিসর্গ ও ২. স্ – জাত বিসর্গ।

১. র্ – জাত বিসর্গ : র স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র – জাত বিসর্গ । যেমন : অন্তর– অন্তঃ, প্রাতর– প্রাতঃ, পুনর – পুনঃ ইত্যাদি।

২. স্–জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্–জাত বিসর্গ। যেমন : নমস্ – নমঃ, পুরস্ – পুরঃ, শিরস্ – শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র্ ও স্–এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি দুইভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ–ধ্বনির পরস্থিত (অঘোষ উষ্মধ্বনি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ – এ তিনে মিলে ও–কার হয়। যেমন– ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ–কারের পরস্থিত স্–জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ–কার ও স্–জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও–কার হয়। যেমন– তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

২. অ–কারের পরস্থিত র্–জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে ‘র’ হয়। যেমন– অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, পুনঃ+ আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ।

এরূপ – পুনর্জন্ম, পুনর্বার, প্রাতরুত্থান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তর্বর্তী ইত্যাদি।

২. ঈ–প্রত্যয় যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : নিশাচর–নিশাচরী, ভয়ংকর–ভয়ংকরী, রজক–রজকী, কিশোর–কিশোরী, সুন্দর–সুন্দরী, চতুর্দশ–চতুর্দশী, ষোড়শ–ষোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : সিংহ–সিংহী, ব্রাহ্মণ–ব্রাহ্মণী, মানব–মানবী, বৈষ্ণব–বৈষ্ণবী, কুমার–কুমারী, ময়ূর–ময়ূরী ইত্যাদি।

৩. ইকা–প্রত্যয় যোগে

(ক) যেসব শব্দের শেষে 'অক্' রয়েছে সেসব শব্দে 'অক্' স্থলে 'ইকা' হয়। যেমন : বালক–বালিকা, নায়ক–নায়িকা, গায়ক–গায়িকা, সেবক–সেবিকা, অধ্যাপক–অধ্যাপিকা ইত্যাদি। কিন্তু গণক–গণকী, নর্তক–নর্তকী, চাতক–চাতকী, রজক–রজকী (বাংলায়) রজকিনী।

(খ) ক্ষুদ্রার্থে ইকা যোগ হয়। যেমন : নাটক–নাটিকা, মালা–মালিকা, গীত–গীতিকা, পুস্তক–পুস্তিকা ইত্যাদি। (এগুলো স্ত্রী প্রত্যয় নয়, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।)

৪। আনী–যোগ করে : ইন্দ্র–ইন্দ্রানী, মাতুল–মাতুলানী, আচার্য–আচার্যানী (কিন্তু আচার্যের কর্মে নিয়োজিত অর্থে আচার্যা)। এরূপ : শূদ্র–শূদ্রা (শূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোক), শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী), ক্ষত্রিয়–ক্ষত্রিয়া/ ক্ষত্রিয়ানী ইত্যাদি।

আনী–প্রত্যয় যোগে কোনো কোনো সময় অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন–অরণ্য–অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম–হিমানী (জমানো বরফ)।

৫. ঈনী, নী, যোগে : মায়াবী–মায়াবিনী, কুহক–কুহকিনী, যোগী–যোগিনী, মেধাবী–মেধাবিনী, দুঃখী–দুঃখিনী ইত্যাদি।

৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

(ক) যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে 'ত্রী' হয়। যেমন– নেতা–নেত্রী, কর্তা–কর্ত্রী, শ্রোতা–শ্রোত্রী, ধাতা–ধাত্রী।

(খ) পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, বান্, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যথা : সৎ–সতী, মহৎ–মহতী, গুণবান–গুণবতী, রূপবান–রূপবতী, শ্রীমান–শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান–গরিয়সী।

(গ) কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন– সম্রাট–সম্রাজ্ঞী, রাজা–রানি, যুবক–যুবতী, শ্বশুর–শাশুড়ি, নর–নারী, বন্ধু–বান্ধবী, দেবর–জা, শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রী, স্বামী–স্ত্রী, পতি–পত্নী, সভাপতি–সভানেত্রী ইত্যাদি।

বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ : খান–খানম, মরদ–জেনানা, মালেক–মালেকা, মুহতারিম–মুহতারিমা, সুলতান–সুলতানা।

নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ : সতীন, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অসূর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য

(ক) কতগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দু–ই বোঝায়। যেমন– জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।

(খ) কতগুলো শব্দে কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন–কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।

(গ) কতগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন– সতীন, সৎমা, সধবা ইত্যাদি।

(ঘ) কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা– দেবর–ননদ (দেবরের বোন)/জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই–বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রী (শিক্ষিকা) (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী), বন্ধু–বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা–দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী)।

(ঙ) বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন : সুন্দর বলদ–সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে–সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো–মেজ খুড়ি ইত্যাদি।

(চ) বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন– মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলি হয়ে গেছে হবে না)। আসমা ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।

(ছ) কুল–উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন : ঘোষ (পুরুষ) ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)।

অনুশীলনী

১। পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। বাংলা শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায়?

৩। বাংলায় আগত তৎসম শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায়?

৪। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের পাঁচটি উদাহরণ দাও।

৫। শুদ্ধ কর : বিধবা স্ত্রী, বেগমা

৬। পার্থক্য নির্ধারণ কর

দিদি–বৌদি, শিক্ষিকা–শিক্ষয়িত্রী, আচার্য–আচার্যানী, শূদ্রা–শূদ্রানী

৭। ঠিক উত্তরে টিক (√) দাও।

(ক) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ– মা, কন্যা, ছাত্রী, বালিকা, বোন/বিমাতা, বিধবা, বন্ধ্যা, ডাইনী;

(খ) নিত্য পুরুষবাচক শব্দ– বাবা, দাদা, হরিণ, পতি, শিশু/ঢাকী, কবিরাজ, কৃতদার;

(গ) সংস্কৃত নী প্রত্যয়– মাতুলানী/ইনি প্রত্যয়–মায়াবিনী।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
শব্দ প্রকরণ
পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

সব ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দভেদ আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে।

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে **পুরুষবাচক শব্দ** আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে **স্ত্রীবাচক শব্দ** বলে। যেমন : বাপ–মা, ভাই–বোন, ছেলে–মেয়ে– কেউই মৃত্যুর সময় তার কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে পুরুষবাচক শব্দ; আর মা, বোন ও মেয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ। তৎসম পুরুষবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন– বিদ্বান লোক এবং বিদুষী নারী। এখানে 'লোক' পুরুষবাচক বিশেষ্য এবং 'নারী' স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। 'বিদ্বান' পুরুষবাচক বিশেষণ এবং 'বিদুষী' স্ত্রীবাচক বিশেষণ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়ম মানা হয় না। যেমন– সংস্কৃতে 'সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা' বাংলায় 'সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা'।

বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

১। বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে এবং ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রীজাতীয় অর্থে।

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে : আব্বা–আম্মা, চাচা–চাচী, কাকা–কাকী, জেঠা–জেঠী, দাদা–দাদী, নানা–নানী, নন্দাই–ননদ, দেওর–জা, ভাই–ভাবী/বৌদি, বাবা–মা, মামা–মামী ইত্যাদি।

২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় অর্থে : খোকা–খুকী, পাগল–পাগলী, বামন–বামনী, ভেড়া–ভেড়ী, মোরগ–মুরগী, বালক–বালিকা, দেওর–ননদ।

২। **বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়**

পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো : ঈ, নি, নী, আনী, ইনী, ন।

১. ঈ–প্রত্যয় : বেঙ্গামা–বেঙ্গামী, ভাগনা/ভাগনে–ভাগনী।

২. নী–প্রত্যয় : কামার–কামারনী, জেলে–জেলেনী, কুমার–কুমারনী, ধোপা–ধোপানী, মজুর–মজুরনী ইত্যাদি।

৩. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং আগের ঈ ই হয়। যেমন : ভিখারি–ভিখারিনী, অভিসারী–অভিসারিণী।

৪. আনী–প্রত্যয় : ঠাকুর–ঠাকুরানী, নাপিত–নাপিতানী, মেথর–মেথরানী, চাকর–চাকরানী ইত্যাদি।

৫. ইনী–প্রত্যয় : কাঙাল–কাঙালিনী, গোয়ালা–গোয়ালিনী, বাঘ–বাঘিনী ইত্যাদি।

উন–প্রত্যয় : ঠাকুর–ঠাকরুন / ঠাকুরানী।

আইন–প্রত্যয় : নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : ঠাকুর–ঠাকুরাইন।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় কতগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন– অভাগা–অভাগী/অভাগিনী, ননদাই–ননদিনী/ননদী ইত্যাদি।

৩। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোর পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন– সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা ইত্যাদি।

৪। কতগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দ এবং স্ত্রী, মাদী, মাদা ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন – নর / মদ্দা / হুলো বিড়াল–মেনি বিড়াল; মদ্দা হাঁস–মাদী হাঁস; মদ্দা ঘোড়া–মাদী ঘোড়া; পুরুষ লোক–মেয়েলোক / স্ত্রীলোক; বেটাছেলে–মেয়েছেলে; পুরুষ কয়েদী –স্ত্রী / মেয়ে কয়েদী; এঁড়ে বাছুর–বকনা বাছুর; বলদ গরু–গাই গরু ইত্যাদি।

৫। কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন– কবি–মহিলা কবি, ডাক্তার–মহিলা ডাক্তার, সভ্য–মহিলা সভ্য, কর্মী–মহিলা কর্মী, শিল্পী–মহিলা বা নারী শিল্পী, সৈন্য–নারী / মহিলা সৈন্য, পুলিশ–মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

৬। কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : বোন–পো– বোন–ঝি, ঠাকুর–পো–ঠাকুর–ঝি, ঠাকুর দাদা / ঠাকুরদা–ঠাকুরমা, গয়লা –গয়লা–বউ, জেলে–জেলে বউ ইত্যাদি।

৭। অনেক সময় আলাদা আলাদা শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন : বাবা–মা, ভাই–বোন, কর্তা–গিন্নী, ছেলে–মেয়ে, সাহেব–বিবি, জামাই–মেয়ে, বর–কনে, দুলহা–দুলাইন/দুলহিন, বেয়াই–বেয়াইন, তাঐ–মাঐ, বাদশা–বেগম, শুক–সারী ইত্যাদি।

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ঈ, আনী, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন–

১. আ–যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : মৃত–মৃতা, বিবাহিত–বিবাহিতা, মাননীয়–মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়–প্রিয়া, প্রথম–প্রথমা, চতুর–চতুরা, চপল–চপলা, নবীন–নবীনা, কনিষ্ঠ–কনিষ্ঠা, মলিন–মলিনা ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : অজ–অজা, কোকিল–কোকিলা, শিষ্য–শিষ্যা, ক্ষত্রিয়–ক্ষত্রিয়া, শূদ্র–শূদ্রা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিরুক্ত শব্দ

দ্বিরুক্ত অর্থ দুবার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দুইবার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন– 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে।' অর্থাৎ ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে এই প্রয়োগ।

দ্বিরুক্ত শব্দ নানা রকম হতে পারে :

(ক) শব্দের দ্বিরুক্তি

১. একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং শব্দ দুটি অবিকৃত থাকে। যথা– ভালো ভালো ফল, ফোঁটা ফোঁটা পানি, বড় বড় বই ইত্যাদি।

২. একই শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটি শব্দ যোগ করে ব্যবহৃত হয়। যথা– ধন–দৌলত, খেলা–ধুলা, লালন–পালন, বলা–কওয়া, খোঁজ–খবর ইত্যাদি।

৩. দ্বিরুক্ত শব্দ–জোড়ার দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তন হয়। যেমন– মিট–মাট, ফিট–ফাট, বকা–ঝকা, তোড়–জোড়, গল্প–সল্প, রকম–সকম ইত্যাদি।

৪. সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ যোগে। যেমন– লেন–দেন, দেনা–পাওনা, টাকা–পয়সা, ধনী–গরিব, আসা–যাওয়া ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তি

১. দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন– ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভেবেছি।

২. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ–বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন– চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

(ক) বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে	:	রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
২. সামান্য বোঝাতে	:	আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।
৩. পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে	:	তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ	:	ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে	:	তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আগ্রহ বোঝাতে	:	ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।

২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি, নরম নরম হাত।

৩. সামান্যতা বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব; কালো কালো চেহারা ।

(গ) সর্বনাম শব্দ

বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : কে কে এলো? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে : এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।

২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।

৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?

৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

(ঙ) অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?

২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।

৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।

৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি।

৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন

একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মরীতি। যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন–

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে : চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।

২. শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে : মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।

৩. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে : ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।

৪. সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে : চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।

৫. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে : ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।

৬. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে : ছোট–বড়, আসা–যাওয়া, জন্ম–মৃত্যু, আদান–প্রদান।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

বিভক্তিযুক্ত পদের দুইবার ব্যবহারকে **পদাত্মক দ্বিরুক্তি** বলা হয়। এগুলো দুই রকমে গঠিত হয়। যেমন–

১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুইবার ব্যবহার। যথা – **ভয়ে ভয়ে** এগিয়ে গেলাম। **হাটে হাটে** বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।

২. যুগ্মরীতিতে গঠিত দ্বিরক্ত পদের ব্যবহার। যথা– হাতে নাতে, আকাশে–বাতাসে, কাপড়–চোপড়, দলে–বলে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

ফুলগুলো তুই আনরে **বাছা বাছা**। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

লোকটা **হাড়ে হাড়ে** শয়তান। (আধিক্য)

খাঁচার **ফাঁকে ফাঁকে**, পরশে **মুখে মুখে**, নীরবে **চোখে চোখে** যায়।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুইবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন–

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার	:	**ভেউ ভেউ** – মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি। এরূপ –ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।
২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার	:	**ঘেউ ঘেউ** (কুকুরের ধ্বনি)। এরূপ–মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।
৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার	:	ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ)। এরূপ–মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ) ঝমঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।
৪. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার	:	**ঝিকিমিকি** (ঔজ্জ্বল্য)। এরূপ– ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার মতো অনুভূতি)। অনুরূপভাবে– মিন মিন, পিট পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠন

১. একই (ধ্বন্যাত্মক) শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ	:	ধক ধক, ঝন ঝন, পট পট।
২. প্রথম শব্দটির শেষে আ যোগ করে	:	গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।
৩. দ্বিতীয় শব্দটির শেষে ই যোগ করে	:	ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি।

৪. যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কিচির মিচির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের শব্দ), হাপুস হুপুস (গোগ্রাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।

৫. আনি–প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য দ্বিরুক্ত গঠিত হয় : পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়। তোমার বকবকানি আর ভালো লাগে না।

বিভিন্ন পদরূপে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার

১. বিশেষ্য : বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।

২. বিশেষণ : 'নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।'

৩. ক্রিয়া : কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ : 'চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।'

অনুশীলনী

১। দ্বিরুক্তি বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী?

২। বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে দ্বিরুক্তি সাধিত হয়?

৩। দ্বিরুক্তি সাধনের তিনটি উপায় উদাহরণসহ লেখ।

৪। পাঁচটি করে উদাহরণ দাও

(ক) বিপরীতার্থক যুগ্মরীতি

(খ) সহচর যুগ্মরীতি

(গ) ধ্বন্যাত্মক যুগ্মরীতি

৫। অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও

কানে কানে, ধনে জনে, আকারে প্রকারে, দেশে বিদেশে, রাতে দিনে, তেলে বেগুনে, ঘর সংসার, ধ্যান ধারণা, চলনে বলনে।

৬। সঠিক উত্তরটি লিখে দাও

ক. অনুভূতিজাত ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি : ঝমঝম/ঝিমঝিম

খ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি : হয় না/হয়

গ. বিশেষ্য দ্বিরুক্তি : ভালোয় ভালোয়/উঁচায় নিচায়

ঘ. ক্রিয়ায় দ্বিরুক্তি : যায় যায়/হাঁটি হাঁটি

ঙ. ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিরুক্তি : ধীরে ধীরে/উড়ু উড়ু

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক 'এক'। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা করতে পারি। যেমন : এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে হয় দশ টাকা।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার

১. অঙ্কবাচক, ২. পরিমাণ বা গণনাবাচক, ৩. ক্রম বা পূরণবাচক ও ৪. তারিখবাচক।

১. অঙ্কবাচক সংখ্যা

'তিন টাকা' বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোঝায়। আমাদের একক হলো 'এক'। সুতরাং এক + এক + এক = তিন।

এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি। এক থেকে একশ পর্যন্ত এভাবে গণনার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুণোত্তর পদ্ধতি।

এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬), সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে বলে অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) দিতে হয়। এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যাটির দশগুণ। এটিই দশ গুণোত্তর প্রণালীর নিয়ম। এ ধরনের প্রতিটি 'দশ'কে একক ধরে আমরা বিশ বা কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চল্লিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০), সত্তর (৭০), আশি (৮০), নব্বই (৯০) পর্যন্ত গণনা করি। তারপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)।

এভাবে আমরা দশের গুণন ও এককের সংকলন করে বিভিন্ন সংখ্যা লিখে থাকি। যেমন : এক দশ + এক = এগার (১০+১=১১), এক দশ চার = চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি। এভাবে দশকের ঘরে দুই (২) হলে বলি দুই দশ = বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক = একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ – তিন দশ + এক = একত্রিশ, চার দশ + এক = একচল্লিশ ইত্যাদি।

২. পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা

একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা–ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন– সপ্তাহ বলতে আমরা সাত দিনের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকি। সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ। এখানে দিন একটি একক। এরূপ–সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ।

পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : একগুণ = এক। যেমন– একেক্কে এক (অর্থাৎ ১×১=১), এরকম–দুয়েক্কে দুই, সাতেক্কে সাত ইত্যাদি। দুই গুণ= দ্বিগুণ বা দুগুণ। যেমন –দুই দু গুণে চার (২×২=৪)।

অনুরূপভাবে, পাঁচ দু গুণে দশ (৫×২=১০), সাত দু গুণে চৌদ্দ (৭×২=১৪)। তিন গুণ = তিরিক্কে। যেমন– তিন তিরিক্কে নয় (৩×৩=৯)।
চার গুণ = চার বা চৌকা। যেমন– তিন চারে বা চৌকা বার (৩×৪=১২)
পাঁচ গুণ = পাঁচা। যেমন– পাঁচ পাঁচা পঁচিশ (৫×৫=২৫)।
ছয় গুণ = ছয়ে। যেমন– তিন ছয়ে আঠার (৩×৬=১৮)।
সাত গুণ = সাতা। যেমন– তিন সাতা একুশ (৩×৭=২১)
আট গুণ = আটা। যেমন– তিন আটা (বা তে আটা) চব্বিশ (৩×৮=২৪)।
নয় গুণ = নং বা নয়। যেমন– তিন নং (বা তিন নয়) সাতাশ (৩×৯=২৭)।
দশ গুণ = দশং বা দশ। যেমন– তিন দশং (বা তিন দশে) ত্রিশ (৩×১০=৩০)।
বিশ গুণ = বিশং বা বিশ। যেমন – তিন বিশং (বা তিন বিশ) ষাট (৩×২০=৬০)।
ত্রিশ গুণ = ত্রিশং বা ত্রিশ। যেমন– তিন ত্রিশং (বা তিন ত্রিশ) নব্বই (৩×৩০=৯০)।

এরূপ– চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই, বা শ'–এর পূরণবাচক সংখ্যা গণনা করা হয়।

পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক 'সংখ্যা শব্দ'

(ক) ন্যূন

এক	এককের	চার ভাগের	এক	ভাগ	($\frac{১}{৪}$)	=	চৌথা, সিকি বা পোয়া।
”	”	তিন ভাগের	”	”	($\frac{১}{৩}$)	=	তেহাই।
”	”	দুই ভাগের	”	”	($\frac{১}{২}$)	=	অর্ধ বা আধা।
”	”	আট ভাগের	”	”	($\frac{১}{৮}$)	=	আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাংশ।

তেমনি– এক পঞ্চমাংশ ($\frac{১}{৫}$), এক দশমাংশ ($\frac{১}{১০}$) ইত্যাদি। এ সবের আরও ভাঙতি হলে, যেমন– চার ভাগের তিন ($\frac{৩}{৪}$) = তিন চতুর্থাংশ। আট ভাগের তিন ($\frac{৩}{৮}$) = তিন অষ্টমাংশ ইত্যাদি। এক এককের ($\frac{৩}{৪}$) কে পরবর্তী সংখ্যার পৌনে বলা হয়। যেমন– পৌনে তিন = (২ $\frac{৩}{৪}$), পৌনে ছয় = (৫ $\frac{৩}{৪}$) ইত্যাদি।

পৌনে অর্থ পোয়া অংশ বা এক চতুর্থাংশ ($\frac{১}{৪}$) কম। অর্থাৎ পৌনে = (১– $\frac{১}{৪}$) = $\frac{৩}{৪}$ ।

সওয়া = ১ $\frac{১}{৪}$ (সওয়া বা সোয়া এক)

দেড় = ১ $\frac{১}{২}$ = $\frac{১}{২}$ কম ২।

আড়াই = ২ $\frac{১}{২}$ = $\frac{১}{২}$ কম ৩।

এগুলো ছাড়া অর্ধযুক্ত থাকলে সর্বত্র 'সাড়ে' বলা হয়। যেমন– ৩ $\frac{১}{২}$ = সাড়ে তিন, ৪ $\frac{১}{২}$ = সাড়ে চার ইত্যাদি।

৩. ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন– **দ্বিতীয়** লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। **দ্বিতীয়** লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় **'প্রথম'** এবং প্রথম লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় **দ্বিতীয়**। এরূপ– তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

৪. তারিখবাচক শব্দ : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে।

যেমন–পয়লা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি। তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি শব্দ বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

নিচে বাংলা অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো

অঙ্ক বা সংখ্যা	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছউই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নউই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনের	পঞ্চদশ	পনেরই
১৯	উনিশ	ঊনবিংশ	উনিশে
২০	বিশ/কুড়ি	বিংশ	বিশে
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে

অনুশীলনী

১. অঙ্কবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক রূপ দেখাও।

৩. নিচের শব্দগুলোকে সংখ্যা শব্দে দেখাও:

চৌথা, নবম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, আড়াই, পৌনে চার, সওয়া তিন, একবিংশ, ঊনবিংশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বচন

'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার : **একবচন** ও **বহুবচন**।

একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে **একবচন** বলে। যেমন – **সে** এলো। **মেয়েটি** স্কুলে যায়নি।

বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে **বহু বচন** বলে। যেমন : **তারা** গেল। **মেয়েরা** এখনও আসেনি।

কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়। কোনো কোনো সময় টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন – গরুটা, বাছুরটা, কলমটা, খাতাখানা, বইখানি ইত্যাদি।

বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশিরভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন–

(ক) রা–কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন– **ছাত্ররা** খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। **শিক্ষকেরা** জ্ঞান দান করেন।

যে ধরনের শব্দে 'রা' যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় 'এরা' ব্যবহৃত হয়। যেমন – **মেয়েরা ঝিয়েরা** একত্র হয়েছে। সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন – '**পাখিরা** আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় **পিপীলিকারা** বিধাতার কাছে পাখা চায়।' **কাকেরা** এক বিরাট সভা করল।

(খ) গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন – **অতগুলো** কুমড়া দিয়ে কী হবে? **আমগুলো** টক। **টাকাগুলো** দিয়ে দাও। **ময়ূরগুলো** পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে।

(ক) উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

গণ	–	দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি।
বৃন্দ	–	সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি।
মণ্ডলী	–	শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি।
বর্গ	–	পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।

(খ) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

কুল	–	কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, বৃক্ষকুল ইত্যাদি।
সকল	–	পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি।
সব	–	ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি।
সমূহ	–	বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি।

(গ) অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ

আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি। যেমন–গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘকুঞ্জ, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : পাল ও যূথ শব্দ দুটি কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন – রাখাল **গরুর পাল** লয়ে যায় মাঠে। **হস্তিযূথ** মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

(ক) বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন – সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু–ই বোঝায়)। **পোকার** আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)। বাগানে **ফুল** ফুটেছে (বহুবচন)।

(খ) একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন– **অজস্র** লোক, **অনেক** ছাত্র, **বিস্তর** টাকা, **বহু** মেহমান, **নানা** কথা, **ঢের** খরচ, **অঢেল** টাকা পয়সা ইত্যাদি।

(গ) অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন – **হাঁড়ি হাঁড়ি** সন্দেশ। **কাঁড়ি কাঁড়ি** টাকা। **বড় বড়** মাঠ। **লাল লাল ফুল**।

(ঘ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন।

বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য – **মেয়েরা** কানাকানি করছে। এটাই **করিমদের** বাড়ি। **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতিদিন জন্মায় না। **সকলে** সব জানে না।

(ঙ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন – আন যোগে : বুজুর্গ–বুজুর্গান, সাহেব–সাহেবান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ওপরে বর্ণিত বহুবচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দের অধিকাংশই তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত এবং সে কারণে অধিকাংশই সাধু রীতি ও সংস্কৃত শব্দে প্রযোজ্য। খাঁটি বাংলা শব্দের বহুবচনে এবং চলিত রীতিতে রা, এরা, গুলা, গুলো, দের – এসব প্রত্যয় এবং অনেক, বহু, সব – এসব শব্দের ব্যবহারই বহুল প্রচলিত।

একইসঙ্গে দুইবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন – **সব মানুষই** অথবা **মানুষ** অথবা **মানুষেরা** মরণশীল (শুদ্ধ)। **সকল মানুষেরাই** মরণশীল (ভুল)।

অনুশীলনী

১। বচন কাকে বলে? বাংলা ভাষায় বচন কয় প্রকার ও কী কী?

২। বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশের উপায় কী কী? দশটি বহুবচনবোধক শব্দের উদাহরণ দিয়ে তোমার বক্তব্য পরিষ্কার কর।

৩। প্রাণিবাচক, অপ্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দে যেসব বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ ও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তার তিনটি করে উদাহরণ দাও।

৪। বিশেষ নিয়মে বহুবচন গঠনের কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ কর।

৫। ভুল থাকলে শুদ্ধ কর।

আমাদের স্কুলের সকল ছাত্ররাই আজ সভায় উপস্থিত। সব গরুগণেরা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে।
প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এ খবর দিয়ে দাও। ভাইগণ, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

৬। ক. ডান দিক থেকে যথাযোগ্য শব্দটি এনে বাঁ দিকের শিরোনামের ডানে বসাও।

একবচন – ছাত্র, মা, তোমরা,পাখিগুলো, গরু, দেশ

বহুবচন – লোকেরা, তাদের, ধনী, গরিব, বেড়াল।

খ. ডান দিক থেকে বহুবচনবোধক শব্দ/ শব্দাংশ নিয়ে বাঁ দিকের শব্দে যোগ কর

কুসুম, ফল, ভাই, দোকান, সাধু কলম, স্যার, মাথা, কাপড়, বই	গুলা, রা, এরা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদাশ্রিত নির্দেশক

কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে **পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক** বলে। বাংলায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The'–এর স্থানীয়। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।

(ক) একবচনে – টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন– টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, বইখানি, লাঠিগাছা, চুড়িগাছি ইত্যাদি।

(খ) বহুবচনে – গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন– মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, পটলগুলিন ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

১. (ক) 'এক' শব্দের সঙ্গে টা, টি, যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– একটি দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন– তিনটি টাকা, দশটি বছর।

(খ) নিরর্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি–র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন–**সারাটি** সকাল তোমার আশায় বসে আছি। **ন্যাকামিটা** এখন রাখ।

(গ) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন– **ওটি** যেন কার তৈরি? **এটা** নয় **ওটা** আন। **সেইটেই** ছিল আমার প্রিয় কলম।

২. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোটা' শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন–

গোটা দেশই ছারখার হয়ে গেছে। **গোটাদুই** কমলালেবু আছে (অনির্দিষ্ট)। **দুখানা** কম্বল চেয়েছিলাম (নির্দিষ্ট)। **গোটাসাতেক** আম এনো। **একখানা** বই কিনে নিও (অনির্দিষ্ট)।

কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধন**খানি**।

৩. টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন– **পোয়াটাক** দুধ দাও (অনির্দিষ্টতা)। **সবটুকু** ওষুধই খেয়ে ফেলো (নির্দিষ্টতা)।

৪. বিশেষ অর্থে, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ : তা, পাটি ইত্যাদি। যেমন–

তা : দশ **তা** কাগজ দাও।

পাটি : আমার এক**পাটি** জুতো ছিঁড়ে গেছে।

অনুশীলনী

১। পদাশ্রিত নির্দেশক কাকে বলে? বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকদের কী রূপভেদ হয়?

২। টি, টা, খানা, খানি – এ চারটি পদাশ্রিত নির্দেশকের প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য রচনা কর।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর

.... পাঁচেক,

.... টি,

মুখ ....,

দুধ ....

৪। শুদ্ধ কর

দুখানি নয় চারখানি নয়, একগোটা ছেলে আমার। মুখ কিতা টুকটুকে লাল। দেশখানির নামটুকুন কী? দশগোটা বেজেছে।

৫। ভুল থাকলে শুদ্ধ করে লেখ

(ক)	টা, টি, খানা, খানি	–	বহু বচনে ব্যবহৃত হয়।
(খ)	রা, এরা, গুলি, গুলা	–	এক বচনে ব্যবহৃত হয়।
(গ)	টুকু, টুকুন	–	স্বল্পতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
(ঘ)	তা, পাটি	–	শব্দের আগে বসে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাস

সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। সমাসের রীতি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। তবে খাঁটি বাংলা সমাসের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলোতে সংস্কৃতের নিয়ম খাটে না।

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্পন্ন পদটির নাম **সমস্ত পদ**।

সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে **সমস্যমান পদ** বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)–কে বলা হয় **পূর্বপদ** এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)–কে বলা হয় **উত্তরপদ** বা **পরপদ**।

সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য**। উদাহরণ–বিলাত–ফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন। এখানে বিলাত–ফেরত, রাজকুমার ও সিংহাসন – এ তিনটিই সমাসবদ্ধ পদ। এগুলোর গঠন প্রক্রিয়া ও রকম – বিলাত হতে ফেরত, রাজার কুমার,সিংহ চিহ্নিত আসন – এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য। এসব ব্যাসবাক্যে 'বিলাত', ফেরত', 'রাজা, 'কুমার,' 'সিংহ', 'আসন' হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ। আর বিলাত–ফেরত, রাজকুমার এবং সিংহাসন সমস্ত পদ। বিলাত, রাজা ও সিংহ হচ্ছে পূর্বপদ এবং ফেরত, কুমার ও আসন হচ্ছে পরপদ।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস।

[দ্বিগু সমাসকে অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কর্মধারয়কেও তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। এদিক থেকে সমাস মূলত চারটি : দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব। কিন্তু সাধারণভাবে ছয়টি সমাসেরই আলোচনা করা গেল। এছাড়া, প্রাদি, নিত্য, অলুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলোরও আলোচনা করা হয়েছে।]

১. দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন – তাল ও তমাল = তাল–তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত–কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে।

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং , ও, আর – এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন – মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১.	মিলনার্থক শব্দযোগে	:	মা–বাপ, মাসি–পিসি, জ্বিন–পরি, চা–বিস্কুট ইত্যাদি।
২.	বিরোধার্থক শব্দযোগে	:	দা–কুমড়া, অহি–নকুল, স্বর্গ–নরক ইত্যাদি।
৩.	বিপরীতার্থক শব্দযোগে	:	আয়–ব্যয়, জমা–খরচ, ছোট–বড়, ছেলে–বুড়ো, লাভ–লোকসান ইত্যাদি।
৪.	অঙ্গবাচক শব্দযোগে	:	হাত–পা, নাক–কান, বুক–পিঠ, মাথা–মুণ্ডু, নাক–মুখ ইত্যাদি।
৫.	সংখ্যাবাচক শব্দযোগে	:	সাত–পাঁচ, নয়–ছয়, সাত–সতের, উনিশ–বিশ ইত্যাদি।
৬.	সমার্থক শব্দযোগে	:	হাট–বাজার, ঘর–দুয়ার, কল–কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা–পত্র ইত্যাদি।
৭.	প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে	:	কাপড়–চোপড়, পোকা–মাকড়, দয়া–মায়া, ধূতি–চাদর ইত্যাদি।
৮.	দুটি সর্বনামযোগে	:	যা–তা, যে–সে, যথা–তথা, তুমি–আমি, এখানে–সেখানে ইত্যাদি।
৯.	দুটি ক্রিয়াযোগে	:	দেখা–শোনা, যাওয়া–আসা, চলা–ফেরা, দেওয়া–থোওয়া ইত্যাদি।
১০.	দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে	:	ধীরে–সুস্থে, আগে–পাছে, আকারে–ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
১১.	দুটি বিশেষণযোগে	:	ভালো–মন্দ, কম–বেশি, আসল–নকল, বাকি–বকেয়া ইত্যাদি।

অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে **অলুক দ্বন্দ্ব** বলে। যেমন – দুধে–ভাতে, জলে–স্থলে, দেশে–বিদেশে, হাতে–কলমে।

* তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব–বিবি–গোলাম, হাত–পা–নাক–মুখ–চোখ ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে। যেমন – নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট। কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন – যে চালাক সেই চতুর = চালাক–চতুর।

২. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন – যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

৩. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃতন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – আগে ধোয়া পরে মোছা= ধোয়ামোছা।

৪. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন – সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।

৫. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন – মহৎ যে জ্ঞান= মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।

৬. পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যেমন – কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।

৭. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন – মহান যে রাজা = মহারাজ।

৮. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন –সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার – মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস।

১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে**। যথা– সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্যসভা, স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ= স্মৃতিসৌধ।

২. উপমান কর্মধারয় : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় **উপমেয়**, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় **উপমান**। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন – ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো **সাধারণ ধর্ম**। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলে। যথা – তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা।

৩. উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** বলে (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। যেমন – মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ। পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ।

৪. রূপক কর্মধারয় : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে **রূপক কর্মধারয় সমাস** হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন– ক্রোধ রূপ অনল =ক্রোধানল, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন রূপ মাঝি= মনমাঝি।

আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন – **অব্যয়** : কুকর্ম, যথাযোগ্য। **সর্বনাম** : সেকাল, একাল। **সংখ্যাবাচক শব্দ** : একজন, দোতলা। **উপসর্গ** : বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর ।

৩. তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন – বিপদকে আপন্ন= বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

১. **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত ।

ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী। এরকম : গা–ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, ছেলে–ভুলানো (ছড়া), নভেল–পড়া ইত্যাদি।

২. **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখা।

ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : **এক দ্বারা ঊন = একোন,** বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচ কম।

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত। এরূপ–হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

৩. **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে । যথা– গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা= আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি= বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি। এরূপ–ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমঙ্গল, মুসাফিরখানা, হজ্বযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি,বালিকা–বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

৪. **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা – খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

সাধারণত চ্যুত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত ইত্যাদি। এ রকম জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর' 'চেয়ে' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যথা– পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।

৫. **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

অনুরূপভাবে –ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, শ্বশুরবাড়ি, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

১. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' স্থলে 'রাজ', পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে 'পিতৃ', 'মাতৃ', 'ভ্রাতৃ' হয়। যেমন গজনীর রাজা = গজনীরাজ, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্রের বধূ=পুত্রবধূ ইত্যাদি।

২. পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, সহ, প্রতিম – এসব শব্দ থাকলেও ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – পত্নীর সহ =পত্নীসহ, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম / সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।

৩. কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা– অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ণ।

৪. পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা– ছাত্রের বৃন্দ =ছাত্রবৃন্দ, গুণের গ্রাম=গুণগ্রাম, হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ ইত্যাদি।

৫. অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন – পথের অর্ধ= অর্ধপথ, দিনের অর্ধ=অর্ধদিন।

৬. শিশু, দুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন – মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি।

৭. ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন – পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি। কিন্তু, ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।

৬. **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** : পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা। এরূপ – বাকপটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিখ্যাত, ভোজনপটু, দানবীর, বাক্সবন্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমরা ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন –পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব।

৭. **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** : না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা– ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ – অনাদর, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন – ন কাল = অকাল বা আকাল। তদ্রূপ– আধোয়া, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

না–বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যথা–

অভাব	–	ন	বিশ্বাস	=	অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব)।
ভিন্নতা	–	ন	লৌকিক	=	অলৌকিক ।
অল্পতা	–	ন	কেশা	=	অকেশা।
বিরোধ	–	ন	সুর	=	অসুর।
অপ্রশস্ত	–	ন	কাল	=	অকাল
মন্দ	–	ন	ঘাট	=	অঘাট।

এরূপ – অমানুষ, অসজ্ঞাত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

৮. **উপপদ তৎপুরুষ সমাস** : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ–প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে **উপপদ তৎপুরুষ সমাস**। যেমন – জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ। এরূপ –গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা–চাটা, পাড়াবেড়ানি, ছা–পোষা ইত্যাদি।

৯. **অলুক তৎপুরুষ সমাস** : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে **অলুক তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ–ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : গায়ে–হলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুব্রীহি সমাস।

৪. বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। যথা– বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে।

বহুব্রীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা : আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা (স্ত্রী), মহান আত্মা যার = মহাত্মা, স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা, নীল বসন যার = নীলবসনা, স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি।

'সহ' কিংবা 'সহিত' শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে 'সহ' ও 'সহিত' এর স্থলে 'স' হয়। যেমন : বান্ধবসহ বর্তমান = সবান্ধব, সহ উদর যার = সহোদর > সোদর। এরূপ – সজল, সফল, সদর্প, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন : নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক, বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক। এরূপ –সস্ত্রীক, অপুত্রক ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদে 'অক্ষি' শব্দের স্থলে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দ স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ। এরূপ – ঊর্ণনাভ।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'জায়া' শব্দ স্থানে 'জানি' হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন : যুবতী জায়া যার = যুবজানি (যুবতী স্থলে 'যুব' এবং 'জায়া' স্থলে জানি হয়েছে)।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'চূড়া' শব্দ সমস্ত পদে 'চূড়' এবং 'কর্ম' শব্দ সমস্ত পদে 'কর্মা' হয়। যেমন : চন্দ্র চূড়া যার = চন্দ্রচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।

বহুব্রীহি সমাসে 'সমান' শব্দের স্থানে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন : সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ, সমান উদর যাদের = সহোদর।

বহুব্রীহি সমাসে পরপদে 'গন্ধ' শব্দ স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যথা : সুগন্ধ যার = সুগন্ধি, পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এরকম : হৃতসর্বস্ব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবখ্ত, কমবখ্ত ইত্যাদি।

২. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি। যথা : আশীতে (দাঁতে) বিষ যার= আশীবিষ, কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব।

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা। অনুরূপভাবে – ছা–পোষা, পা–চাটা, পাতা–চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে **ব্যতিহার বহুব্রীহি** হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যথা : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি ভাবে –চুলাচুলি, কাড়াকাড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুঁতাগুঁতি, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি।

৪. নঞ্ বহুব্রীহি

বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ্ বহুব্রীহি বলে । নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন : ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান, বে (নাই) হেড যার = বেহেড, না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার। নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা ইত্যাদি। এরকম–নাহক, নিরুপায়, নির্ঝঞ্ঝাট, অবুঝ, অকেজো, বে–পরোয়া, বেহুঁশ, অনন্ত, বেতার ইত্যাদি।

৫. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন : বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনি ভাবে – গায়ে হলুদ, মেনিমুখো ইত্যদি।

৬. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি । যথা– এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ+আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি–খরচে (খরচ+এ)। এরকম –দোটানা, দোমনা, একগুঁয়ে, অকেজো, একঘরে, দোনলা, দোতলা, ঊনপাঁজুরে ইত্যাদি।

৭. অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার= গলায়গামছা (লোকটি)। এরূপ – হাতে–ছড়ি, কানে–কলম, গায়ে–পড়া, হাতে–বেড়ি, মাথায়–ছাতা, মুখে–ভাত, কানে–খাটো ইত্যাদি।

৮. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যথা – দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা । এরূপ –চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

কিন্তু, সে (তিন) তার (যে যন্ত্রের) = সেতার (বিশেষ্য)।

৯. নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি

দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

৫. দ্বিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন : তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা, শত অব্দের সমাহার–শতাব্দী, পঞ্চবটের সমাহার–পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার–ত্রিপদী ইত্যাদি। এরূপ–অষ্টধাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গ, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমুদ্র ইত্যাদি।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ') = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হলো।

১. সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।

২. বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ।

৩. অভাব (নিঃ = নির) : আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব=নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।

৪. পর্যন্ত (আ) : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।

৫. সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন।

৬. অনতিক্রম্যতা (যথা) : রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ–যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।

৭. অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।

৮. বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।

৯. পশ্চাৎ (অনু) : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন।

১০. ঈষৎ (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।

১১. ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।

১২. পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম) : পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ।

১৩. দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) : অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ। এরূপ –প্রপিতামহ।

১৪. প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি) : প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবিম্ব।

১৫. প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর।

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্রাদি, নিত্য, উপপদ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এসব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়।

১. **প্রাদি সমাস** : প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস। যথা : প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এরূপ –পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ =অনুতাপ, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত) = প্রভাত, প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি ইত্যাদি।

২. **নিত্যসমাস** : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর, কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র, অন্য গৃহ = গৃহান্তর, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।

অনুশীলনী

১. সমাসের সাহায্যে কীভাবে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

২. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের এবং বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের যে কর্মধারয় সমাস হয়, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।

৩. 'দ্বিগু সমাস প্রকৃত প্রস্তাবে আলাদা সমাস নয়, এটি কর্মধারয় সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত'–আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪. উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।

৫. তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে সবগুলো তৎপুরুষ সমাসের নাম কর।

৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দম্পতি, ধানক্ষেত, প্রগতি, বেতার, সহশিক্ষা।

৭. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৮. উদাহরণ দাও

সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বসে যে সমাস হয়, অলুক তৎপুরুষ, বহুব্রীহি সমাসের 'সহ' স্থলে 'স' হয়, অব্যয় পদ আগে বসে যে সমাস হয়, উপমেয়ের সাথে উপমানের যে সমাস হয়।

৯. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) দাও

ক. তৎপুরুষ সমাস হয় –পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় / সমান বিভক্তি বিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদে যে সমাস হয় / পূর্বপদে অব্যয় যোগে যে সমাস হয়।

খ. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সে সমাস হয় তাকে বলে –দ্বন্দ্ব / বহুব্রীহি / অলুক / দ্বিগু সমাস।

গ. উপমান–উপমেয়ের যে সমাস হয় তাকে বলে –নিত্যসমাস / প্রাদি সমাস / কর্মধারয় সমাস।

১০. সমাসবদ্ধ শব্দ লেখ এবং ডান দিক থেকে ঠিক সমাসের নামটি পাশে লেখ–

কাঁচা অথচ মিঠা	: .... তৎপুরুষ	মা মরেছে যার	: .... অব্যয়ীভাব
মহান যে নবি	: .... কর্মধারয়	দশ হাত পরিমাণ যার	: .... বহুব্রীহি
দুধে ভাতে	: .... দ্বন্দ্ব	তিন ফলের সমাহার	: .... দ্বিগু।
বিলাত থেকে ফেরত	: .... তৎপুরুষ		

সপ্তম পরিচ্ছেদ
উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।

২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।

৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।

৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে। এবং

৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। যেমন – 'কাজ' একটি শব্দ । এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' – যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

'পূর্ণ' (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' যোগ করায় 'পরিপূর্ণ' হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ (অর্থে ও আকৃতিতে)। 'হার' শব্দের পূর্বে 'আ' যুক্ত করে 'আহার' (খাওয়া), 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা), 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ),'পরি' যোগ করে 'পরিহার' (ত্যাগ), 'উপ' যোগ করে 'উপহার' (পুরস্কার), 'সম' যোগ করে 'সংহার' (বিনাশ) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

এ উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে : বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) এবং বিদেশি উপসর্গ।

১. বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

নিচে এদের প্রয়োগ দেখানো হলো।

	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
১.	অ	নিন্দিত	অর্থে	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	–	অভাব	”	অচিন, অজানা, অথৈ
	–	ক্রমাগত	”	অঝোর, অঝোরে

	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
২.	অঘা	বোকা	অর্থে	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
৩.	অজ	নিতান্ত (মন্দ)	”	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
৪.	অনা	অভাব	”	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	–	ছাড়া	”	অনাছিষ্টি, অনাচার
	–	অশুভ	”	অনামুখো
৫.	আ	অভাব	’’	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি
	–	বাজে, নিকৃষ্ট	”	আকাঠা, আগাছা
৬.	আড়	বক্র	”	আড়চোখে, আড়নয়নে
	–	আধা, প্রায়	”	আক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
	–	বিশিষ্ট	”	আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবর), আড়কাঠি
৭.	আন	না	”	আনকোরা
	–	বিক্ষিপ্ত	”	আনচান, আনমনা
৮.	আব	অস্পষ্টতা	”	আবছায়া, আবডাল
৯.	ইতি	এ বা এর	”	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	–	পুরনো	”	ইতিকথা, ইতিহাস
১০.	ঊন (ঊনা)	কম	”	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ
১১.	কদ্	নিন্দিত	”	কদবেল, কদর্য, কদাকার
১২.	কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	”	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ
১৩.	নি	নাই/নেতি	”	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট
১৪.	পাতি	ক্ষুদ্র	”	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো
১৫.	বি	ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয়	”	বিভূঁই, বিফল, বিপথ
১৬.	ভর	পূর্ণতা	”	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে
১৭.	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	”	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
১৮.	স	সঙ্গে	”	সরাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
১৯.	সা	উৎকৃষ্ট	”	সাজিরা, সাজোয়ান
২০.	সু	উত্তম	”	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
২১.	হা	অভাব	”	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

জ্ঞাতব্য : বাংলা উপসর্গ সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বেই যুক্ত হয়ে থাকে।

বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের বাক্যে প্রয়োগ : 'আমি অবেলাতে দিলাম পাড়ি অথৈ সায়রে।' অঘারাম বাস করে অজ পাড়াগাঁয়ে। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। আকাঠার নায়ে দিলাম কাঁঠালের গলুই। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে'। ইতিহাস কথা কয়। ঊনাভাতে দুনা বল। নিনাইয়ার শতেক নাও। ভর দুপুরে কোথায় যাও? এতদিন কোথায় নিখোঁজ হয়েছিলে?

২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকোচন সম্প্রসারণ করে থাকে।

তৎসম উপসর্গ বিশটি : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে। বাংলা উপসর্গের মধ্যে আ, সু, বি, নি– এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন –আকাশ, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি–ও বাংলা। আর আকণ্ঠ, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। কাজেই এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি–ও তৎসম উপসর্গ।

নিচে বিশটি তৎসম উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হলো

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
১.	প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	অর্থে	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
	–	খ্যাতি	"	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
	–	আধিক্য	"	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
	–	গতি	"	প্রবেশ, প্রস্থান
	–	ধারা–পরম্পরা বা অনুগামিত	"	প্রপৌত্র, প্রশাখা,
২.	পরা	আতিশয্য	,,	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
	–	বিপরীত	,,	পরাজয়, পরাভব
৩.	অপ	বিপরীত	,,	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	–	নিকৃষ্ট	,,	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
	–	স্থানান্তর	,,	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
	–	বিকৃত	,,	অপমৃত্যু

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
৪.	সম্	সম্যক রূপে	অর্থে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	–	সম্মুখে	”	সমাগত, সম্মুখ
৫.	নি	নিষেধ	”	নিবৃত্তি
	–	নিশ্চয়	”	নিবারণ, নির্ণয়
	–	আতিশয্য	”	নিদাঘ, নিদারুণ
	–	অভাব	”	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
৬.	অব	হীনতা	”	অবজ্ঞা, অবমাননা
	–	সম্যকভাবে	”	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	–	নিম্নে/অধোমুখিতা	”	অবতরণ, অবরোহণ
	–	অল্পতা	”	অবশেষ, অবসান, অবেলা
৭.	অনু	পশ্চাৎ	”	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
	–	সাদৃশ্য	”	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
	–	পৌনঃপুন	”	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
	–	সঙ্গে	”	অনুকূল, অনুকম্পা
৮.	নির	অভাব	”	নিরব, নির্জীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ধন
	–	নিশ্চয়	”	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	–	বাহির/বহির্মুখিতা	”	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
৯.	দুর	মন্দ	”	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
	–	কষ্টসাধ্য	”	দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
১০.	বি	বিশেষ রূপে	”	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক
	–	অভাব	”	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
	–	গতি	”	বিচরণ, বিক্ষেপ
	–	অপ্রকৃতস্থ	”	বিকার, বিপর্যয়
১১.	সু	উত্তম	”	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
	–	সহজ	”	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	–	আতিশয্য	”	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
১২.	উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	”	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
	–	আতিশয্য	অর্থে	উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন
	–	প্রস্তুতি	”	উৎপাদন, উচ্চারণ
	–	অপকর্ষ	”	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট
১৩.	অধি	আধিপত্য	”	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
	–	উপরি	”	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	–	ব্যাপ্তি	”	অধিকার, অধিবাস, অধিগত
১৪.	পরি	বিশেষ রূপ	”	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	–	শেষ	”	পরিশেষ
	–	সম্যক রূপে	”	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
	–	চতুর্দিক	”	পরিভ্রমণ, পরিমণ্ডল
১৫.	প্রতি	সদৃশ	”	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	–	বিরোধ	”	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	–	পৌনঃপুন	,,	প্রতিদিন, প্রতিমাস
		অনুরূপ কাজ	,,	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
১৬.	উপ	সামীপ্য	”	উপকূল, উপকণ্ঠ
	–	সদৃশ	”	উপদ্বীপ, উপবন
	–	ক্ষুদ্র	”	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
	–	বিশেষ	”	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
১৭.	অভি	সম্যক	”	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত
	–	গমন	”	অভিযান, অভিসার
	–	সম্মুখ বা দিক	”	অভিমুখ, অভিবাদন
১৮.	অতি	আতিশয্য	”	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	–	অতিক্রম	”	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
১৯	আ	পর্যন্ত	”	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	–	ঈষৎ	”	আরক্ত, আভাস
	–	বিপরীত	”	আদান, আগমন

বাক্যে তৎসম উপসর্গের প্রয়োগ

কালের প্রভাবে নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে। ওসমান রণক্ষেত্রে বীরত্বের **পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন** করেও **পরাজিত** হলেন। **সমাগত** সুধীজনকে সাদর **অভিনন্দন** জানানো হলো। তাঁর পুত্রদের সঙ্গে চিঠিপত্র **আদান–প্রদান** নেই বলে তাঁর দুঃখের সীমা–**পরিসীমা** নেই।

৩. বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি – এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এর কতগুলো খাঁটি উচ্চারণে আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এ সঙ্গে কতগুলো বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় **বেমালুম** মিশে গিয়েছে। বেমালুম শব্দটিতে 'মালুম' আরবি শব্দ আর 'বে' ফারসি উপসর্গ। এরূপ– বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেয়া হলো।

ক. ফারসি উপসর্গ

	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
১.	কার্	কাজ	অর্থে	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
২.	দর্	মধ্যস্থ, অধীন	”	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান
৩.	না	না	”	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
৪.	নিম্	আধা	”	নিমরাজি, নিমখুন
৫.	ফি	প্রতি	”	ফি–রোজ, ফি–হপ্তা, ফি–বছর, ফি–সন, ফি–মাস
৬.	বদ্	মন্দ	”	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
৭.	বে	না	”	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার
৮.	বর্	বাইরে, মধ্যে	”	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
৯.	ব্	সহিত	”	বমাল, বনাম, বকলম
১০.	কম্	স্বল্প	”	কমজোর, কমবখ্ত

খ. আরবি উপসর্গ

	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
১.	আম্	সাধারণ	”	আমদরবার, আমমোক্তার
২.	খাস	বিশেষ	”	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
৩.	লা	না	”	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
৪.	গর্	অভাব	”	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

গ. ইংরেজি উপসর্গ

	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	অর্থে	উদাহরণ
১.	ফুল	পূর্ণ	’’	ফুল–হাতা, ফুল–শার্ট, ফুল–বাবু, ফুল–প্যান্ট
২.	হাফ	আধা	’’	হাফ–হাতা, হাফ–টিকেট, হাফ–স্কুল, হাফ–প্যান্ট
৩.	হেড	প্রধান	’’	হেড–মাস্টার, হেড–অফিস, হেড–পণ্ডিত, হেড–মৌলভি
৪.	সাব	অধীন	’’	সাব–অফিস, সাব–জজ, সাব–ইন্‌সপেক্টর

ঘ. উর্দু–হিন্দি উপসর্গ

হর : প্রত্যেক অর্থে – হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

বাক্যে বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ

হিসেবে **গরমিল** থাকলে **খাসমহল** লাটে উঠবে। **বহাল** তবিয়তে **দস্তখত** করে **ফি–রোজ হেড অফিসে** আসা যাওয়া কর।

অনুশীলনী

১। উপসর্গ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কয় শ্রেণির উপসর্গের ব্যবহার আছে? প্রত্যেক শ্রেণির পাঁচটি করে উদাহরণ দাও।

২। ‘উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ–দ্যোতকতা আছে।’ – বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলা, তৎসম, বিদেশি– প্রত্যেক শ্রেণির তিনটি করে উপসর্গের উদাহরণ দিয়ে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৪। অর্থ উল্লেখ করে বাক্য রচনা কর

দরকাঁচা, বরবাদ, ফি–হপ্তা, না–মঞ্জুর, বেহেড, কারখানা, লা–জওয়াব, অনুগমন, অতিবৃষ্টি, প্রতিদিন, বদনজর

৫। পার্থক্য নির্দেশ কর ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও

বনাম–বেনাম; সুবাদ–অপবাদ; বহাল–বেহাল; বিগত–আগত; নিঃশ্বাস–প্রশ্বাস; অনুজ্ঞা–অবজ্ঞা;

৬। শুদ্ধ হলে (√) চিহ্ন এবং অশুদ্ধ হলে (x) চিহ্ন দাও।

ক. উপসর্গ স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. অন্য শব্দের আগে বসে।

গ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির কোনো পরিবর্তন হয় না।

ঘ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

৭। নিচের কোনটি কোন ধরনের উপসর্গ?

নিখাদ, প্রতিদিন, ফি–বছর, বেহায়া, অনুসরণ, উপহার, আলুনি, বেতমিজ, নিখুঁত, ফুলবাবু, বিভুঁই, অনুবাদ, পাতিহাঁস, রামছাগল, নিমরাজি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধাতু

বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর সাধারণ আলোচনা

বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। সেসব ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। অন্যকথায় ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় : (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন – 'করে' একটি ক্রিয়াপদ। এতে দুটো অংশ রয়েছে : কর্ +এ; এখানে 'কর্' ধাতু এবং 'এ' বিভক্তি। সুতরাং 'করে' ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো 'কর্' আর ক্রিয়া বিভক্তি হলো 'এ' । অন্যকথায় 'কর্' ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'করে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

প্রচলিত বেশকিছু ধাতু বা ক্রিয়ামূল চেনার একটা উপায় হলো : বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করা । কারণ, এই রূপ আর ধাতুরূপ এক। যেমন –তুই, কর্, খা, যা, ডাক্, দেখ্, লেখ্ ইত্যাদি। এগুলো যেমন ধাতুও, তেমনি মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদও ।

ধাতুর প্রকারভেদ

ধাতু তিন প্রকারের : (১) মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু এবং (৩) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. মৌলিক ধাতু

যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোই মৌলিক ধাতু। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন –চল্, পড়্, কর্, শো, হ্, খা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (ক) বাংলা, (খ) সংস্কৃত এবং (গ) বিদেশি ধাতু।

ক. বাংলা ধাতু : যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি সেগুলো হলো বাংলা ধাতু। যেমন – কাট্, কাঁদ, জান্, নাচ্ ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন – কৃ, গম্, ধৃ, গঠ্, স্থা ইত্যাদি।

এখানে সংস্কৃত ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদ এবং সংস্কৃত ধাতুর একই অর্থবোধক বাংলা ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদের উদাহরণ দেয়া হলো।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঙ্ক্	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক্	আঁকা
কথ্	কথ্য, কথিত	কহ্	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন, কর্তিত	কাট্	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর্	করা, করে

সংস্কৃত ধাতু	**সাধিত পদ**	**বাংলা ধাতু**	**সাধিত পদ**
ক্রন্দ্	ক্রন্দন	কাঁদ্	কাঁদা, কাঁদুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কিন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ্	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ্	গঠিত	গড়্	গড়া, গড়ন
ঘৃষ্	ঘৃষ্ট, ঘর্ষণ	ঘষ্	ঘষা
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ্	দেখা, দেখন
ধৃ	ধৃত, ধারণ	ধর্	ধরা, ধরন
পঠ্	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়্	পড়া, পড়ন
বন্ধ্	বন্ধন	বাঁধ্	বাঁধন, বাঁধা
বুধ্	বুদ্ধ, বোধ	বুঝ্	বুঝা
রক্ষ্	রক্ষণ, রক্ষিত, রক্ষী	রাখ্	রাখা
শ্রু	শ্রবণ, শ্রুত	শুন্	শুনা, শোনা
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক্	থাকা
হস্	হাস, হাসন	হাস্	হাসা, হাসি

গ. বিদেশাগত ধাতু : প্রধানত হিন্দি এবং ক্বচিৎ আরবি–ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে **বিদেশাগত** ধাতু বা **ক্রিয়ামূল** বলা হয়। যেমন – ভিক্ষে **মেগে** খায়। এ বাক্যে **'মাগ্'** ধাতু হিন্দি **'মাঙ্'** থেকে আগত। এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয় **অজ্ঞাতমূল** ধাতু। যেমন – **'হের** ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?'এ বাক্যে **'হের'** ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

এখানে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেয়া হলো।

ধাতু	**যে অর্থে ব্যবহৃত হয়**	**ধাতু**	**যে অর্থে ব্যবহৃত হয়**
আঁট	শক্ত করে বাঁধা	ফির্	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
খাট্	মেহনত করা	চাহ্	প্রার্থনা করা
চেঁচ্	চিৎকার করা	বিগড়	নষ্ট হওয়া
জম্	ঘনীভূত হওয়া	ভিজ্	সিক্ত হওয়া
ঝুল্	দোলা	ঠেল্	ঠেলা
টান্	আকর্ষণ	ডাক্	আহ্বান করা
টুট্	ছিন্ন হওয়া	লটক্	ঝুলানো
ডর্	ভীত হওয়া		

২. সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু কিংবা কোনো কোনো নাম –শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন – দেখ্ + আ= দেখা, পড়+আ= পড়া, বল+আ=বলা। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় । যেমন – মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। (এখানে দেখ্+আ+বর্তমান কালের সাধারণ নামপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি 'য়' = দেখায়) । এরূপ –শোনায়, বসায় ইত্যাদি।

গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু তিন শ্রেণিতে বিভক্ত :

ক. নাম ধাতু, খ. প্রযোজক (নিজন্ত) ধাতু, (গ) কর্মবাচ্যের ধাতু।

ক. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতুটি গঠিত হয় তা–ই নাম ধাতু। যেমন –সে ঘুমাচ্ছে। 'ঘুম্' থেকে নাম ধাতু 'ঘুমা'। 'ধমক্' থেকে নাম ধাতু 'ধমকা' । যেমন আমাকে ধমকিও না।

খ. প্রযোজক ধাতু : মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন – কর্ + আ= করা (এখানে 'করা' একটি ধাতু) । যেমন – সে নিজে করে না, আর একজনকে দিয়ে করায়। অনুরূপভাবে– পড় + আ=পড়া; তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

গ. কর্মবাচ্যের ধাতু : মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যমধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যথা – দেখ্+ আ=দেখা; কাজটি ভালো দেখায় না। হার্+আ=হারা; 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেস্টা বেটাই চোর।'

'কর্মবাচ্যের ধাতু' বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন– 'দেখায়' এবং 'হারায়' প্রযোজক ধাতু।

৩. সংযোগমূলক ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তা–ই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন – যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর্ (ধাতু) = 'যোগ কর' (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য– তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ করো। সাবধান (বিশেষ্য) +হ (ধাতু) = সাবধান হ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য– এখনও সাবধান হও, নতুবা আখেরে খারাপ হবে। সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই–ই হতে পারে। নিচে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. কর্–ধাতু যোগে

ক.	বিশেষ্যের সঙ্গে	:	ভয় কর্, লজ্জা কর্, গুণ কর্
খ.	বিশেষণের সঙ্গে	:	ভালো কর্, মন্দ কর্, সুখী কর্
গ.	ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে	:	ক্রয় কর্, দান কর্, দর্শন কর্, রান্না কর্
ঘ.	ক্রিয়াজাত (কৃদন্ত) বিশেষণের সঙ্গে	:	সঞ্চিত কর্, স্থগিত কর্
ঙ.	ক্রিয়া–বিশেষণের সঙ্গে	:	জলদি কর্, তাড়াতাড়ি কর্, একত্র কর্

চ. অব্যয়ের সঙ্গে : না কর্, হাঁ কর্, হায় হায় কর্, ছি ছি কর্

ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে : খাঁ খাঁ কর্, বন বন কর্, টন টন কর্

জ. ধ্বন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে : চট কর্, ধাঁ কর্, হন হন কর্

২. হ–ধাতু যোগে : বড় হ, ছোট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ

৩. দে–ধাতু যোগে : উত্তর দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে

৪. পা–ধাতু যোগে : কান্না পা, ভয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা

৫. খা–ধাতু যোগে : মার খা, হিমশিম খা, ছাক খা, ঘষা খা

৬. কাট্–ধাতু যোগে : সাঁতার কাট্, ভেংচি কাট্, জিভ কাট্

৭. ছাড়–ধাতু যোগে : গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়

৮. ধর্–ধাতু যোগে : গলা ধর্, ঘুণে ধর্, পচা ধর্, মাথা ধর্, গোঁ ধর্।

অনুশীলনী

১। ধাতু বলতে কী বোঝ? ক্রিয়াপদ দেখে সহজে ধাতু চেনার উপায় কী?

২। ধাতু কয় প্রকার ও কী কী? সংস্কৃত মূল ধাতু ও বাংলা মূল ধাতুর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৩। নিচের সাধিত পদসমূহের ধাতু নির্ণয় কর এবং সাধিত ধাতুটি তৎসম হলে তার বাংলা রূপ এবং বাংলা হলে তার তৎসম রূপ নির্ণয় করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

খাদ্য, কথিত, বুঝ, নাচন, কথা, দৃশ্য, শেখা, দর্শন

৪। সাধিত ধাতু কী? সাধিত ধাতু কয় ভাগে বিভক্ত? এদের নাম লেখ।

৫। "বিভিন্ন পদের সঙ্গে 'কর' বা 'খা' ধাতুর সংযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়" – উদাহরণ দাও।

৬। ক. কোন্‌টি ঠিক? ধাতু– দুই প্রকার/ তিন প্রকার/ চার প্রকার

খ. বিদেশি ধাতু কোন্‌টি ? কাট্ / কৃৎ / টান্

৭। ডান দিক থেকে শব্দ এনে ঠিক সংজ্ঞার পার্শ্বে বসাও

মৌলিক ধাতু ----- কৃ, চল্, পড়্, খাদ্, আঁট

সাধিত ধাতু ----- শোনায়, বসায়, মুচড়ানো

যৌগিক ধাতু---- উত্তর দে, মার খা, ভয় পা।

নবম পরিচ্ছেদ

কৃৎ প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা

তোমরা লক্ষ করেছ যে, ক্রিয়ামূলকে বলা হয় ধাতু, আর ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কালবাচক বিভক্তি যোগ করে গঠন করা হয় **ক্রিয়াপদ**। ধাতুর সঙ্গে যখন কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি–সমষ্টি যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ তৈরি হয়, তখন (১) ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় **ক্রিয়া প্রকৃতি** বা **প্রকৃতি**; আর (২) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে বলে **কৃৎ–প্রত্যয়**। যেমন– চল্ (ক্রিয়া প্রকৃতি)+ অন (কৃৎ–প্রত্যয়)= চলন (বিশেষ্য পদ)। চল্ (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন্ত (কৃৎ–প্রত্যয়)=চলন্ত (বিশেষণ পদ)।

'প্রকৃতি' কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে √ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ প্রকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করলে **'প্রকৃতি'** শব্দটি লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন –√পড়+ উয়া =পড়ুয়া। √নাচ্+উনে = নাচুনে।

কৃৎ–প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় **কৃদন্ত পদ**। যেমন – ওপরের উদাহরণে 'পড়ুয়া' ও 'নাচুনে' কৃদন্ত পদ।

তৎসম বা সংস্কৃত প্রকৃতির সঙ্গেও অনুরূপভাবে কৃৎ–প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত পদ সাধিত হয়। যেমন – √গম্+অন=গমন, √কৃ+তব্য=কর্তব্য ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ–প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ–প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় **গুণ ও বৃদ্ধি** ।

১. **গুণ** : (ক) ই, ঈ–স্থলে এ, (খ) উ, ঊ–স্থলে ও এবং (গ) ঋ–স্থলে অর্ হয়। যেমন – √চিন্+আ=চেনা (ই স্থলে এ হলো); √নী+আ=নেওয়া (ঈ স্থলে এ); ' √ধু+আ =ধোয়া (উ স্থলে ও) ; কৃ+তা = করতা> কর্তা (ঋ স্থলে অর্)।

২. **বৃদ্ধি** : (ক) অ–স্থলে আ, (খ) ই ও ঈ–স্থলে ঐ, (গ) উ ও ঊ স্থলে ঔ এবং (ঘ) ঋ–স্থলে আর্ হয়। যেমন – পচ্ + অ (ণক) = পাচক (পচ–এর অ স্থলে 'আ'); শিশু+ অ(ষ্ণ) = শৈশব (ই স্থলে ঐ); যুব+ অন= যৌবন (উ স্থলে ঔ); কৃ+ঘ্যণ= কার্য (ঋ স্থলে আর্)।

বাংলা কৃৎ–প্রত্যয়

কৃৎ–প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : বাংলা

১. **(০) শূন্য–প্রত্যয়** : কোনো প্রকার প্রত্যয়–চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া–প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে (০) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন – এ মোকদ্দমায় তোমার জিত্ হবে না, হার্–ই হবে। গ্রামে খুব ধর্ পাকড় চলছে।

২. **অ–প্রত্যয়** : কেবল ভাববাচ্যে অ–প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন – √ধর্+ অ=ধর, √মার +অ=মার। আধুনিক বাংলায় অ–প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন – √হার্ + অ=হার, √জিত্+ অ = জিত।

কোনো কোনো সময় অ–প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়। যেমন – (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত) √কাঁদ্ + অ = কাঁদকাঁদ (চেহারা)। এরূপ – √পড়্+অ=পড়পড়, √মর্+অ=মরমর (অবস্থা) ইত্যাদি। কখনো কখনো দ্বিত্বপ্রাপ্ত কৃদন্ত পদে উ–প্রত্যয় হয়। যেমন – √ডুব্+উ= ডুবুডুবু। √উড়্+উ = উড়ুউড়ু।

৩. **অন্–প্রত্যয়:** ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন – √কাঁদ্ + অন= কাঁদন (কান্নার ভাব)। এরূপ – নাচন, বাড়ন, ঝুলন, দোলন।

বিশেষ নিয়ম

(ক) আ–কারান্ত ধাতুর সঙ্গে অন্ স্থলে 'ওন' হয়। যেমন – √খা+অন=খাওন, √ছা+অন=ছাওন, √দে+অন=দেওন।

(খ) আ–কারান্ত প্রযোজক (ণিজন্ত) ধাতুর পরে 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হলে 'আনো' হয়। যেমন – √জানা+আন= জানানো। এরূপ –শোনানো, ভাসানো।

৪. **অনা–প্রত্যয় :** √দুল্+ অনা= দুলনা> দোলনা। √খেল্+ অনা=খেলনা।

৫. **অনি, (বিকল্পে) উনি–প্রত্যয়:** √চির্+অনি=চিরনি>চিরুনি। √বাঁধ্+অনি=বাঁধনি > বাঁধুনি। √আঁট+অনি=আঁটনি> আঁটুনি।

৬. **অন্ত–প্রত্যয়:** বিশেষণ গঠনে 'অন্ত' প্রত্যয় হয়। যেমন – √উড়্+অন্ত =উড়ন্ত, √ডুব্+অন্ত=ডুবন্ত।

৭. **অক–প্রত্যয় :** √মুড়্+অক=মোড়ক। √ঝল্+অক=ঝলক।

৮. **আ–প্রত্যয় :** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'আ' প্রত্যয় হয়। যেমন √পড়্+আ=পড়া (পড়া বই)। এরূপ রাঁধ (বিশেষ্য), রাঁধা (বিশেষণ), কেনা, বেচা, ফোটা ইত্যাদি।

৯। **আও–প্রত্যয় :** ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে 'আও' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন– √পাকড়্+আও= পাকড়াও, √চড় +আও=চড়াও।

১১. **আন (আনো) প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে 'আন/আনো' প্রত্যয় হয়। যেমন – √চাল্ =আন =চালান/চালানো। √মান্+ আন = মানান/মানানো।

১২. **আনি–প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত হয়। যেমন – √জান্ + আনি=জানানি, √শুন্+আনি=শুনানি, √উড় + আনি=উড়ানি, √উড়+উনি=উড়ুনি।

১৩. **আরি বা আরী বিকল্পে রি/উরি–প্রত্যয় :** যেমন – √ডুব্+আরি / উরি=ডুবুরী। এরূপ –ধুনারী, পূজারী ইত্যাদি

১৪. **আল–প্রত্যয় :** √মাত্+আল = মাতাল, √মিশ্+আল =মিশাল।

১৫. **ই–প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে 'ই' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা–√ভাজ্+ই = ভাজি, √বেড়+ই= বেড়ি।

১৬. **ইয়া > ইয়ে–প্রত্যয় :** বিশেষণ গঠনে ইয়া/ ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন – √মর্ +ইয়া=মরিয়া (মরতে প্রস্তুত), √বল্ + ইয়ে=বলিয়ে (বাকপটু)। এরূপ – নাচিয়ে, গাইয়ে, লিখিয়ে, বাজিয়ে, কইয়ে ইত্যাদি।

১৭. **উ–প্রত্যয়** : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘উ’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা – √ডাক্ + উ= ডাকু, √ঝাড় + উ= ঝাড়ু, √উড়+উ= উড়ু (দ্বিত্ব উড়ুউড়ু)

১৮. **‘উয়া’ বিকল্পে ‘ও’ – প্রত্যয়** : বিশেষ্য বিশেষণ গঠনে ‘উয়া’ এবং ‘ও’ প্রত্যয় হয়। যথা – √পড় + উয়া= পড়ুয়া > পড়ো, √উড়+ উয়া= উড়ুয়া > উড়ো, √উড়+ও +উড়ো (চিঠি)।

১৯. **তা–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে ‘তা’ প্রত্যয় হয়। যেমন – √ফির্+তা = ফিরতা> ফেরতা, √পড় + তা= পড়তা, √বহ্+ তা = বহতা।

২০. **তি–প্রত্যয়** : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘তি’ প্রত্যয় হয়। যেমন – √ঘাট্+তি=ঘাটতি, √বাড়+তি=বাড়তি। এরূপ – কাটতি, উঠতি ইত্যাদি।

২১. **না–প্রত্যয়** : বিশেষ্য গঠনে ‘না’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন – √কাঁদ্ + না = কাঁদনা > কান্না, √রাঁধ্+না=রাঁধনা> রান্না। এরূপ–ঝরনা ইত্যাদি।

কৃৎ–প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : সংস্কৃত

১. **অনট্–প্রত্যয়** : (‘ট’ ইৎ (বিলুপ্ত) হয়, ‘অন’ থাকে) : √নী+অনট্= √নী+অন>নে+অন (গুণসূত্রে) = নয়ন, √শ্রু+ অনট্= √শ্রু+অন (গুণ ও সন্ধির ফলে) = শ্রবণ। এরূপ – স্থান, ভোজন, নর্তন, দর্শন ইত্যাদি।

২. **ক্ত–প্রত্যয় (‘ক্’ ইৎ ‘ত’ থাকে)** : √জ্ঞা+ক্ত (জ্ঞা+ত) = জ্ঞাত, √খ্যা+ক্ত=খ্যাত।

বিশেষ নিয়ম

(ক) ক্ত–প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্ত্যস্বর ‘ই’ কার হয়। যেমন – √পঠ্+ক্ত=(পঠ্+ই+ত) = পঠিত। এরূপ –লিখিত, বিদিত, বেষ্টিত, চলিত, পতিত, লুণ্ঠিত, ক্ষুধিত, শিক্ষিত ইত্যাদি।

(খ) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্তস্থিত ‘চ’ ও ‘জ’ স্থলে ‘ক’ হয়। যেমন– √সিচ্+ক্ত=(সিক্+ত) সিক্ত। এরূপ–√মুচ্+ক্ত=মুক্ত, √ভুজ্+ক্ত=ভুক্ত।

(গ) এ ছাড়া ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। এখানে এরূপ কয়েকটি প্রকৃতি–প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন– √গম্+ক্ত = গত, √গ্রন্থ্+ক্ত = গ্রথিত, √চুর্+ক্ত = চূর্ণ, √ছিদ্+ক্ত=ছিন্ন, √জন্+ক্ত=জাত, √দা+ক্ত=দত্ত, √দহ্+ক্ত=দগ্ধ, √বচ্+ক্ত=উক্ত, √বপ্+ক্ত=উপ্ত, √মুহ্+ক্ত=মুগ্ধ, √যুধ্+ক্ত=যুদ্ধ, √লভ্+ক্ত=লব্ধ, √স্বপ্+ক্ত=সুপ্ত, √সৃজ্+ক্ত=সৃষ্ট, √হন্+ক্ত= হত ইত্যাদি।

৩. **ক্তি–প্রত্যয় (‘ক’ ইৎ ‘তি’ থাকে)** : √গম্+ ক্তি=√গম্+তি=গতি (এখানে ‘ম’ লোপ হয়েছে)।

বিশেষ নিয়ম

(ক) ক্তি–প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা– √মন্+ক্তি=মতি, √রম্+ক্তি=রতি।

(খ) কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ–কারের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ আ–কার হয়। যেমন – √শ্রম্+ক্তি=শ্রান্তি (সন্ধিসূত্রে ম>ন), √শম্+ক্তি=শান্তি।

(গ) ‘চ’ এবং ‘জ’ স্থলে ‘ক’ হয়। যেমন –√বচ্+ক্তি=উক্তি, √মুচ্+ক্তি=মুক্তি, √ভজ্+ক্তি=ভক্তি।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ : √গৈ+ক্তি=গীতি, √সিধ্+ক্তি=সিদ্ধি, √বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি, √শক্+ক্তি=শক্তি।

৪. তব্য ও অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে (ক) তব্য ও (খ) অনীয় প্রত্যয় হয়।

(ক) তব্য : √কৃ+তব্য=কর্তব্য, √দা+তব্য=দাতব্য, √পঠ্+তব্য=পঠিতব্য।

(খ) অনীয় : √কৃ+অনীয়=করণীয়, √রক্ষ্+অনীয় = রক্ষণীয়। এরূপ–দর্শনীয়, পানীয়, শ্রবণীয়, পালনীয় ইত্যাদি।

৫. তৃচ্–প্রত্যয় ('চ' ইৎ 'তৃ' থাকে) : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন– √দা+তৃচ্=√দা+তৃ=√দা+তা= দাতা √মা+তৃচ্=মাতা, √ক্রী+তৃচ্=ক্রেতা।

বিশেষ নিয়মে : √যুধ্ +তৃচ=√যুধ্+তা=যোদ্ধা।

৬. ণক–প্রত্যয় ('ণ' ইৎ 'অক' থাকে) : √পঠ্+ণক=√পঠ্+অক=পাঠক। মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'অ' স্থানে 'আ' হয়েছে। যেমন–√নী=ণক=(নৈ+অক–প্রথম স্বরের বৃদ্ধি) নায়ক, √গৈ+ণক=গায়ক, √লিখ্+ণক= লেখক ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম

(ক) ণক–প্রত্যয় পরে থাকলে ণিজন্ত ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন – √পূঁজি+ণক=পূজক। এরূপ– জনক, চালক, স্তাবক।

(খ) আ–কারান্ত ধাতুর পরে ণক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়' আসে। যথা–√দা+ণক=দায়ক, বি– √ধা+ণক=বিধায়ক।

৭. ঘ্যণ–প্রত্যয় [ঘ,ণ–ইৎ, য (য–ফলা) থাকে] : কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ্ হয়। যথা– √কৃ+ঘ্যণ্=কার্য্য>কার্য, √ধৃ+ঘ্যণ্=ধার্য। এরূপ –পরিহার্য, বাচ্য, ভোজ্য, যোগ্য, হাস্য ইত্যাদি।

(**দ্রষ্টব্য :** আধুনিক বাংলা বানানে রেফ+য+য=র্য্য হয় না, র্য হয়।)

৮. য–প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও ঔচিত্য অর্থে 'য' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'য' যুক্ত হলে আ–কারান্ত ধাতুর আ–কার স্থলে এ–কারান্ত হয় এবং 'য' 'য়' হয়। যেমন – √দা +য=দা>দে+য>য়=দেয়। √হা+য=হেয়।

এরূপ –বিধেয়, অজেয়, পরিমেয়, অনুমেয় ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম : ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর 'য' প্রত্যয় স্থলে য–ফলা হয়। যথা–√গম্+য=গম্য, √লভ্+য=লভ্য।

৯. ণিন–প্রত্যয় (ণ ইৎ, ইণ্ থাকে, ইন্ 'ঈ'–কার হয়) : √গ্রহ + ণিন=গ্রাহী, √পা+ণিন=পায়ী। এরূপ– কারী, দ্রোহী, সত্যবাদী, ভাবী, স্থায়ী, গামী। কিন্তু 'ণিন' যুক্ত হলে 'হন' ধাতুর স্থলে 'ঘাত' হয়। যথা – আত্ম–√হণ্+ণিন=আত্মঘাতী।

১০. ইন্ প্রত্যয় (ইন্)=ঈ–কার হয়) : √শ্রম্+ইন্=শ্রমী।

১১. অল্–প্রত্যয় (ল ইৎ, অ থাকে) : √জি+অল্=জয়, √ক্ষি+অল্ = ক্ষয়। এরূপ–ভয়, নিচয়, বিনয়, ভেদ, বিলয়। ব্যতিক্রম : √হণ্+অল্=বধ।

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় কৃৎ–প্রত্যয়

১. ইষ্ণু–প্রত্যয় : √চল্+ইষ্ণু = চলিষ্ণু। এরূপ –ক্ষয়িষ্ণু, বর্ধিষ্ণু।

২. বর–প্রত্যয় : √ঈশ্+বর=ঈশ্বর, √ভাস্+বর =ভাস্বর। এরূপ–নশ্বর, স্থাবর।

৩. র–প্রত্যয় : √হিন+স্+র=হিংস্র, √নম্+র=নম্র।

৪. **উক/উক–প্রত্যয়** : √ভু+উক=(ভৌ+উক) =ভাবুক, জাগৃ+উক=(জাগর+উক) জাগরূক।

৫. **শানচ্–প্রত্যয় (‘শ’ ও ‘চ’ ইৎ, ‘আন’ বিকল্পে ‘মান’ থাকে)** : √দীপ্+ শানচ্=দীপ্যমান। এরূপ – √চল্+শানচ্=চলমান, √বৃধ্+শানচ্=বর্ধমান।

৬. **ঘঞ–প্রত্যয়** [(কৃদন্ত বিশেষ্য গঠনে), ঘ্ এবং ঞ ইৎ, ‘অ’ থাকে] : √বস্+ঘঞ্=বাস, √যুজ্+ঘঞ্= যোগ, √ক্রুধ্+ঘঞ্=ক্রোধ, √খুদ্+ঘঞ্=খেদ, √ভিদ্+ঘঞ্=ভেদ।

বিশেষ নিয়ম : √ত্যজ্+ঘঞ্=ত্যাগ, √পচ্ +ঘঞ্=পাক, √শুচ্+ঘঞ্=শোক।

কিন্তু, √নন্দি+অন=নন্দন। এক্ষেত্রে আ যোগে ‘নন্দনা’ হয় না।

অনুশীলনী

১। ধাতু ও ক্রিয়া প্রকৃতির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর

(ক) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে-----।

(খ) কৃৎ–প্রত্যয়সাধিত পদটিকে বলা হয়-----।

৩। গুণ ও বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ?

৪। নিচের প্রত্যয়গুলোর কোনটি ‘ইৎ’ হয় লেখ।

অনট্, আন্, শানচ্, তৃচ্, ণিন্, ঘঞ্, ঘ্যণ্, ক্তি, ক্ত

৫। নিচের কৃৎ–প্রত্যয়সাধিত শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। √পঠ্+ক্ত=পঠিত, √শম্+ক্তি=শান্তি, √শুচ্+ঘঞ্=শোক, √নী+তৃচ্=নেতা

৬। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

নাচুনে, ঝরনা, নিবুনিবু, চেনা, মাতাল, ভূত, লিখিত, বুদ্ধ, চরণ, উক্তি, অনুরাগী, বিধায়ক, জাগরূক

৭। ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর

জমানো, ডরানো, হাঁকানো, লটকানো, ঝরনা

৮। যেটি ঠিক তার ডানে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক. ক্রিয়ামূলকে/ ক্রিয়ার কালকে/ক্রিয়াপদকে/ অক্রিয়াবাচক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপ্রকৃতি।

খ. কৃদন্তপদকে / ক্রিয়াপদকে/ক্রিয়া বিশেষণকে/ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়।

গ. কৃৎ প্রত্যয়হীন পদকে/ কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে / ক্রিয়ামূলকে বলা হয় কৃদন্তপদ।

৯। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর

ঘাটতি, ঝলক, রাঁধুনি, ঝাড়ু, দর্শন, মুক্ত, মুগ্ধ, উপ্ত, ভোজ্য, জয়

দশম পরিচ্ছেদ

তদ্ধিত প্রত্যয়

১. ছেলেটি বড় **লাজুক**।

২. **বড়াই** করা ভালো না।

৩. **ঘরামি** ডেকে ঘর ছেয়ে নে।

ওপরের 'লাজুক', 'বড়াই' শব্দগুলো গঠিত হয়েছে এভাবে : লাজুক= লাজ + উক; বড়াই=বড়+আই; ঘরামি = ঘর+আমি। 'লাজ' 'বড়' ও 'ঘর' শব্দগুলোর পরে যথাক্রমে 'উক', 'আই' ও 'আমি' (প্রত্যয়) যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে।

শব্দের সঙ্গে (শেষে) যেসব প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়।

দ্রষ্টব্য : 'লাজ' 'বড়' ও 'ঘর'– এ শব্দগুলোর সাথে কোনো শব্দ/বিভক্তি যুক্ত হয় নি। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় **প্রাতিপদিক**। প্রাতিপদিক তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি বলে প্রাতিপদিককে **নাম প্রকৃতিও** বলা হয়।

ধাতু যেমন কৃৎ–প্রত্যয়ের প্রকৃতি, তেমনি প্রাতিপদিকও তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি। প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুকে বলা হয় **ক্রিয়া প্রকৃতি** এবং প্রাতিপদিককে বলা হয় **নাম প্রকৃতি**।

তদ্ধিত প্রত্যয়গুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার।

ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

খ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়।

গ. তৎসম বা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ।

(ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

১. আ–প্রত্যয়

(ক) অবজ্ঞার্থে : চোর + আ = চোরা, কেস্ট + আ = কেস্টা।

(খ) বৃহদার্থে : ডিঙি + আ= ডিঙা (সপ্তডিঙা মধুকর)।

(গ) সদৃশ অর্থে : বাঘ+আ=বাঘা, হাত + আ=হাতা। এরূপ : কাল –কালা (চিকন কালা), কান–কানা।

(ঘ) 'তাতে আছে' বা 'তার আছে' অর্থে : জল + আ=জলা, গোদ + আ=গোদা। এরূপ : রোগ –রোগা, চাল– চালা, লুন–লুনা>লোনা।

(ঙ) সমষ্টি অর্থে : বিশ –বিশা, বাইশ–বাইশা (মাসের বাইশা> বাইশে।

(চ) স্বার্থে : জট+আ=জটা, চোখ–চোখা, চাক–চাকা।

(ছ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : হাজির –হাজিরা, চাষ–চাষা।

(জ) জাত ও আগত অর্থে : মহিষ>ভইস–ভয়সা (ঘি), দখিন–দখিনা> দখনে (হাওয়া)।

২. আই–প্রত্যয়

(ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : বড়+আই=বড়াই, চড়া +আই=চড়াই।

(খ) আদরার্থে : কানু+আই=কানাই, নিম+আই=নিমাই।

(গ) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত বোঝাতে : বোন+আই= বোনাই, ননদ–নন্দাই, জেঠা–জেঠাই (মা)।

(ঘ) সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনে : মিঠা +আই=মিঠাই।

(ঙ) জাত অর্থে : ঢাকা+আই=ঢাকাই (জামদানি), পাবনা–পাবনাই (শাড়ি)।

(চ) বিশেষণ গঠনে : চোর–চোরাই (মাল), মোগল–মোগলাই (পরোটা)।

৩. আমি/আম/আমো/মি–প্রত্যয়

(ক) ভাব অর্থে : ইতর+আমি =ইতরামি, পাগল+আমি = পাগলামি, চোর+আমি =চোরামি, বাঁদর+আমি =বাঁদরামি, ফাজিল +আমো=ফাজলামো।

(খ) বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে : ঠক+আমো=ঠকামো (ঠকের বৃত্তি বা ভাব), ঘর+আমি=ঘরামি।

(গ) নিন্দা জ্ঞাপন : জেঠা+আমি=জেঠামি, ছেলে+আমি=ছেলেমি।

৪. ই/ঈ–প্রত্যয়

(ক) ভাব অর্থে : বাহাদুর +ই = বাহাদুরি, উমেদার–উমেদারি।

(খ) বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে : ডাক্তার–ডাক্তারি, মোক্তার–মোক্তারি, পোদ্দার–পোদ্দারি, ব্যাপার–ব্যাপারি, চাষ–চাষি।

(গ) মালিক অর্থে : জমিদার–জমিদারি, দোকান–দোকানি।

(ঘ) জাত, আগত বা সম্বন্ধ বোঝাতে : ভাগলপুর–ভাগলপুরি, মাদ্রাজ–মাদ্রাজি, রেশম–রেশমি, সরকার–সরকারি (সম্বন্ধ বাচক)।

৫. ইয়া> এ–প্রত্যয়

(ক) তৎকালীনতা বোঝাতে : সেকাল + এ=সেকেলে, একাল+এ=একেলে, ভাদর +ইয়া = ভাদরিয়া> ভাদুরে (কইমাছ)।

(খ) উপকরণ বোঝাতে : পাথর –পাথরিয়া> পাথুরে, মাটি –মেটে, বালি– বেলে।

(গ) উপজীবিকা অর্থে : জাল–জালিয়া>জেলে, মোট–মুটে।

(ঘ) নৈপুণ্য বোঝাতে : খুন–খুনিয়া> খুনে, দেমাক–দেমাকে, না (নৌকা) – নাইয়া> নেয়ে।

(ঙ) অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে : টনটন– টনটনে (জ্ঞান), কনকন –কনকনে (শীত), গনগন –গনগনে (আগুন), চকচক– চকচকে (জুতা)।

৬. উয়া> ও–প্রত্যয়

(ক) রোগগ্রস্ত অর্থে : জ্বর + উয়া = জ্বরুয়া>জ্বরো। বাত+উয়া=বাতুয়া> বেতো (ঘোড়া)।

(খ) যুক্ত অর্থে : টাক – টেকো।

(গ) সেই উপকরণে নির্মিত অর্থে : খড়–খড়ো (খড়োঘর)।

(ঘ) জাত অর্থে : ধান–ধেনো।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থে : মাঠ–মেঠো, গাঁ–গাঁইয়া> গেঁয়ো।

(চ) উপজীবিকা অর্থে : মাছ–মাছুয়া> মেছো।

(ছ) বিশেষণ গঠনে : দাঁত–দেঁতো (হাসি), ছাঁদ–ছেঁদো (কথা), তেল–তেলো> তেলা (মাথা), কুঁজ–কুঁজো (লোক)।

৭. **উ–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে : ঢাল +উ = ঢালু, কল+উ=কলু।

৮. **উক–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে : লাজ–লাজুক, মিশ–মিশুক, মিথ্যা–মিথ্যুক।

৯. **আরি/আরী/আরু–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে: ভিখ–ভিখারি, শাঁখ–শাঁখারি, বোমা–বোমারু।

১০. **আলি/আলো/আলি/আলী>এল–প্রত্যয়** : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে: দাঁত–দাঁতাল, লাঠি–লাঠিয়াল> লেঠেল, তেজ–তেজাল, ধার–ধারাল, শাঁস–শাঁসাল, জমক–জমকালো, দুধ–দুধাল> দুধেল, হিম–হিমেল, চতুর– চতুরালি, ঘটক– ঘটকালি, সিঁদ–সিঁদেল, গাঁজা–গেঁজেল।

১১. **উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে–প্রত্যয়** : হাট–হাটুরিয়া> হাটুরে, সাপ–সাপুড়িয়া>সাপুড়ে, কাঠ–কাঠুরে।

১২. **উড়–প্রত্যয়** : অর্থহীনভাবে : লেজ–লেজুড়।

১৩. **উয়া/ওয়া>ও–প্রত্যয়**: সম্পর্কিত অর্থে : ঘর+ওয়া = ঘরোয়া, জল+ উয়া=জলুয়া>জলো (দুধ)।

১৪. **আটিয়া / টে–প্রত্যয়** : বিশেষণ গঠনে : তামা–তামাটিয়া> তামাটে, ঝগড়া–ঝগড়াটে, ভাড়া–ভাড়াটে, রোগা–রোগাটে।

১৫. **অট>ট–প্রত্যয় : স্বার্থে** : ভরা –ভরাট, জমা–জমাট।

১৬. **লা–প্রত্যয়** : (ক) বিশেষণ গঠনে : মেঘ–মেঘলা

(খ) স্বার্থে : এক–একলা, আধ–আধলা।

(খ) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

১. **ওয়ালা > আলা (হিন্দি)** : বাড়ি–বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে), দিল্লি–দিল্লিওয়ালা (অধিবাসী অর্থে), মাছ–মাছওয়ালা (বৃত্তি অর্থে), দুধ–দুধওয়ালা (বৃত্তি অর্থে)।

২. **ওয়ান>আন (হিন্দি)** : গাড়ি–গাড়োয়ান, দার –দারোয়ান।

৩. **আনা>আনি (হিন্দি)** : মুনশি–মুনশিয়ানা, বিবি–বিবিআনা, হিন্দু–হিন্দুয়ানি।

৪. **পনা (হিন্দি)** : পানি–পানসা> পানসে, এক–একসা, কাল (কাল)–কালসা>কালসে।

৫. **গর> কর (ফারসি)** : কারিগর, বাজিকর, সওদাগর।

৬. **দার (ফারসি)** : তাঁবেদার, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারাদার।

৭. **বাজ (দক্ষ অর্থে –ফারসি)** : কলমবাজ, ধড়িবাজ, ধোঁকাবাজ, গলাবাজ+ই=গলাবাজি (বিশেষ্য)।

৮. **বন্দি (বন্দ্–ফারসি)** : জবানবন্দি, সারিবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দ।

৯. **সই : মতো অর্থে** : জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই।

দ্রষ্টব্য : 'টিপসই' ও 'নামসই' শব্দ দুটোর 'সই' প্রত্যয় নয়। এটি 'সহি' (অর্থ–স্বাক্ষর) শব্দ থেকে উৎপন্ন।

(গ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ইত, ইমন, ইল, ইষ্ট, ঈন, তর, তম, তা, ত্ব, নীন, নীয়, বতুপ্, বিন্, র, ল প্রভৃতি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয়, সেগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় । এখানে কতগুলো সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দেয়া হলো।

কয়েকটি সাধারণ সূত্র

১. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ)–প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা– নগর+ষ্ণ=নাগর, মধুর +ষ্ণ=মাধুর্য।

বৃদ্ধি : (১) অ–স্থানে আ, (২) ই, ঈ–স্থানে ঐ, (৩) উ, ঊ–স্থানে ঔ এবং (৪) ঋ–স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

২. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ–কারও ও–কারে পরিণত হয়। ও +অ সন্ধিতে 'অব' হয়। যথা–গুরু+ষ্ণ=গৌরব, লঘু+ষ্ণ =লাঘব, শিশু +ষ্ণ=শৈশব, মধু +ষ্ণ=মাধব, মনু + ষ্ণ=মানব।

৩. দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দের অথবা উপসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপসর্গসহ শব্দের বা শব্দ দুটির মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা–

পরলোক +ষ্ণিক =পারলৌকিক।

সুভগ+ষ্ণ্য=সৌভাগ্য।

পঞ্চভূত+ষ্ণিক=পাঞ্চভৌতিক।

সর্বভূমি+ ষ্ণ=সার্বভৌম।

ব্যতিক্রম : 'বর্ষ' শব্দ পরপদ হলে পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দের মূল স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যথা–দ্বিবর্ষ +ষ্ণিক= দ্বিবার্ষিক। সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকলেও নিয়মমতো মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন –বর্ষ + ষ্ণিক=বার্ষিক।

৪. 'য' প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে স্থিত অ, আ, ই এবং ঈ–এর লোপ হয়। যথা – সম্+য =সাম্য, কবি +য =কাব্য, মধুর +য =মাধুর্য, প্রাচী+য=প্রাচ্য।

ব্যতিক্রম : সভা+য=সভ্য ('সাভ্য' নয়)।

কয়েকটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

১. **ইত–প্রত্যয়** : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

কুসুম +ইত=কুসুমিত, তরঙ্গ+ইত=তরঙ্গিত, কণ্টক+ইত=কণ্টকিত।

২. **ইমন্–প্রত্যয়** : বিশেষ্য গঠনে

নীল+ইমন=নীলিমা। মহৎ+ইমন=মহিমা।

৩. **ইল্–প্রত্যয়** : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

পঙ্ক+ইল্=পঙ্কিল, উর্মি +ইল্ =উর্মিল, ফেন+ইল্=ফেনিল।

৪. **ইষ্ঠ–প্রত্যয়** : অতিশায়নে

গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ, লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ।

৫. **ইন্ (ঈ)–প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ** গঠনে

জ্ঞান +ইন্= জ্ঞানিন্ সুখ+ইন্=সুখিন্।

গুণ+ইন্=গুণিন্ মান+ইন্=মানিন্।

সমাসে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্ লোপ পায়। যেমন – জ্ঞানীগণ, গুণিগণ, সুখিগণ, মানিজন ইত্যাদি ।

কর্তৃকারকের এক বচনে ইন্ প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে। যেমন–

জ্ঞান+ইন্ (ঈ) –জ্ঞানী, গুণ+ ইন্(ঈ) গুণী ইত্যাদি।

স্ত্রী লিঙ্গে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে ঈ–যুক্ত হয়ে ইনী রূপ গ্রহণ করে। যেমন–

জ্ঞান+ইনী–জ্ঞানিনী, গুণ+ইনী =গুণিনী ইত্যাদি।

৬. **তা ও ত্ব–প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে**

বন্ধু+ তা =বন্ধুতা, শত্রু+তা = শত্রুতা।

বন্ধু+ত্ব=বন্ধুত্ব, গুরু+ত্ব = গুরুত্ব।

ঘন+ত্ব=ঘনত্ব, মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব।

৭. **তর ও তম–প্রত্যয় : অতিশায়নে**

মধুর–মধুরতর, মধুরতম। প্রিয়–প্রিয়তর, প্রিয়তম।

৮. **নীন (ঈন)– প্রত্যয় : তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ গঠনে**

সর্বজন+নীন=সর্বজনীন, কুল+নীন =কুলীন, নব+নীন=নবীন।

৯. **নীয় (ঈয়) –প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে**

জল+নীয় =জলীয়, বায়ু+নীয় =বায়বীয়, বর্ষ+নীয় =বর্ষীয়।

বিশেষ নিয়মে : পর–পরকীয়, স্ব–স্বকীয়, রাজা–রাজকীয়।

১০. বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)–প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে যথাক্রমে 'বান্ এবং 'মান্' হয়] : বিশেষণ গঠনে

গুণ+বতুপ্=গুণবান, দয়া+বতুপ্ = দয়াবান।

শ্রী+মতুপ্=শ্রীমান, বুদ্ধি+মতুপ্=বুদ্ধিমান।

১১. বিন (বী) প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে

মেধা+বিন্=মেধাবী, মায়া+বিন্ = মায়াবী, তেজঃ+বিন্= তেজস্বী, যশঃ +বিন্=যশস্বী।

১২. র–প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

মধু+র=মধুর, মুখ+র=মুখর।

১৩. ল–প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

শীত +ল = শীতল, বৎস +ল= বৎসল।

১৪. ষ্ণ (অ) প্রত্যয়

(ক) অপত্য অর্থে : মনু+ষ্ণ =মানব, যদু +ষ্ণ=যাদব।

(খ) উপাসক অর্থে : শিব+ ষ্ণ= শৈব, জিন+ষ্ণ=জৈন।এরূপ: শক্তি–শাক্ত, বুদ্ধ–বৌদ্ধ, বিষ্ণু–বৈষ্ণব।

(গ) ভাব অর্থে : শিশু +ষ্ণ =শৈশব, গুরু+ষ্ণ =গৌরব, কিশোর+ষ্ণ=কৈশোর।

(ঘ) সম্পর্ক বোঝাতে : পৃথিবী+ ষ্ণ = পার্থিব, দেব+ষ্ণ=দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম)+ ষ্ণ=চৈত্র।

নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষ্ণ=সৌর (সাধারণ নিয়মে সুর+ষ্ণ (অ)=সৌর)।

১৫. ষ্ণ্য (য) প্রত্যয়

(ক) অপত্যার্থে : মনুঃ +ষ্ণ্য=মনুষ্য, জমদগ্নি+ষ্ণ্য=জামদগ্ন্য।

(খ) ভাবার্থে : সুন্দর+ষ্ণ্য=সৌন্দর্য, শূর+ষ্ণ্য=শৌর্য। ধীর+ষ্ণ্য=ধৈর্য, কুমার +ষ্ণ্য =কৌমার্য।

(গ) বিশেষণ গঠনে : পর্বত +ষ্ণ্য = পার্বত্য, বেদ+ষ্ণ্য =বৈদ্য।

১৬. ষ্ণি (ই)–প্রত্যয় : অপত্য অর্থে

রাবণ+ষ্ণি=রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি।

১৭. ষ্ণিক (ইক)–প্রত্যয়

(ক) দক্ষ বা বেত্তা অর্থে : সাহিত্য +ষ্ণিক=সাহিত্যিক, বেদ+ষ্ণিক=বৈদিক, বিজ্ঞান+ষ্ণিক=বৈজ্ঞানিক।

(খ) বিষয়ক অর্থে : সমুদ্র+ষ্ণিক=সামুদ্রিক, নগর–নাগরিক, মাস–মাসিক, ধর্ম–ধার্মিক, সমর–সামরিক, সমাজ–সামাজিক।

(গ) বিশেষণ গঠনে : হেমন্ত +ষ্ণিক=হৈমন্তিক, অকস্মাৎ+ষ্ণিক=আকস্মিক।

১৮. ষ্ণেয় (এয়)–প্রত্যয়

ভগিনী+ষ্ণেয়=ভাগিনেয়, অগ্নি+ষ্ণেয়=আগ্নেয়, বিমাতৃ (বিমাতা) +ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়।

অনুশীলনী

১। তদ্ধিত প্রত্যয় বলতে কী বোঝ? তদ্ধিত প্রত্যয়কে শব্দ প্রত্যয় বলা যায় কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতি বলা হয় কেন?

৩। নিম্নলিখিত খাঁটি বাংলা তদ্ধিতান্ত শব্দসমূহে কী অর্থে কোন কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।

হাজিরা	–	জলা	–	মিঠাই	–	লেজুড়	–	চামচা	–
দরকারি	–	টেকো	–	মিথ্যুক	–	ঘরোয়া	–	ঢাকাই	–

৪। দুটি করে উদাহরণ দাও।

(ক) ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির (প্রাতিপদিকের) স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(খ) ষ্ণ প্রত্যয় যুক্ত হলে মূলস্বরের বৃদ্ধি ছাড়াও প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উ–কার থাকলে তা ও–কার হয়।

(গ) তদ্ধিতান্ত শব্দের প্রকৃতি দুটি শব্দে গঠিত হলে অথবা শব্দটি উপসর্গযুক্ত থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই (উপসর্গসহ) মূলস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

কাব্য, ভাগিনেয়, বৈজ্ঞানিক, বায়বীয়, সর্বজনীন, সুখী, কুসুমিত, ফেনিল, শীতল, মধুর, কুলীন, পার্বত্য, বৌদ্ধ, সূর্য, পৌরুষ, মেধাবী।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক. প্রাতিপদিক বলা হয়– বিভক্তিযুক্ত পদকে / সমস্যমান পদকে/ বিভক্তিহীন পদকে।

খ. বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় – দুই প্রকার / তিন প্রকার / চার প্রকার

গ. ওয়ালা (দুধওয়ালা) – বাংলা / বিদেশি/ তৎসম তদ্ধিত প্রত্যয়

ঘ. উড় (লেজুড়) – বাংলা / বিদেশি/ তৎসম তদ্ধিত প্রত্যয়

ঙ. ইত (কুসুমিত) বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্ধিত প্রত্যয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) মৌলিক ও (খ) সাধিত

২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) যৌগিক, (খ) রূঢ়ি এবং (গ) যোগরূঢ়

৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) তৎসম, (খ) অর্ধ–তৎসম (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি ও (ঙ) বিদেশি।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন – গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), ডুবুরি (ডুব্+উরি), চলন্ত (চল্ + অন্ত), প্রশাসন (প্র+শাসন), গরমিল (গর+মিল) ইত্যাদি।

২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. যৌগিক শব্দ

খ. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

গ. যোগরূঢ় শব্দ

ক. যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন–

গায়ক = গৈ + ণক (অক) – অর্থ : গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।

মধুর = মধু + র –অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।

দৌহিত্র = দুহিতা+ষ্ণ্য –অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।

চিকামারা = চিকা+মারা –অর্থ : দেওয়ালের লিখন।

খ. রূঢ়ি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন–হস্তী=হস্ত + ইন, অর্থ–হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো+এষণা) অর্থ– গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এ রকম–

বাঁশি – বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

তৈল – শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন– বাদাম–তেল।

প্রবীণ – শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সন্দেশ – শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।

গ. **যোগরূঢ় শব্দ** : সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন–

পঙ্কজ – পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।

রাজপুত – 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।

মহাযাত্রা – মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দরূপে অর্থ 'মৃত্যু'।

জলধি – 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

৩. **উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ** : বাংলা ভাষা অধ্যায়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে। বিভাগগুলোর নাম লেখ।

২। অর্থগতভাবে বা অর্থের বিচার–বিশ্লেষণে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে, উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহ রূঢ়ি, যোগরূঢ় ও যৌগিক–এই তিনটি গুচ্ছে প্রদত্ত ছক অনুসারে সাজাও।

ভাগিনেয়, জলধি, রাজপুত, রাজপুত্র, বাঁশি, তেল, সন্দেশ।

রূঢ়ি	যোগরূঢ়	যৌগিক শব্দ

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিগত এবং ব্যবহারিক অর্থ লেখ।

ক) সন্দেশ খ) হরিণ গ) প্রবীণ ঘ) মহাযাত্রা

৫। নিচের শব্দগুলো কোনটি কোন শ্রেণিতে পড়ে লেখ।

নীলিমা, এক, জনৈক, হাত, ছেলেধরা, সাপ, আসমান–জমিন, বেহায়াপনা, সাপুড়িয়া, হাত–পা, লাজুক, সাংবাদিক, পাগলামি, বাড়িওয়ালা, চা বাগান।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদ–প্রকরণ

দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য চাঁদের দেশে পৌঁছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন।

ওপরের বাক্যটিতে ‘রা’ (অভিযাত্রী + রা), ‘এর’ (মানুষ + এর), ‘র’ (কল্পনা + র), ‘এ’ (মঙ্গলগ্রহ + এ) প্রভৃতি চিহ্নগুলোকে বিভক্তি বলা হয়।

বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।

পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার : সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।
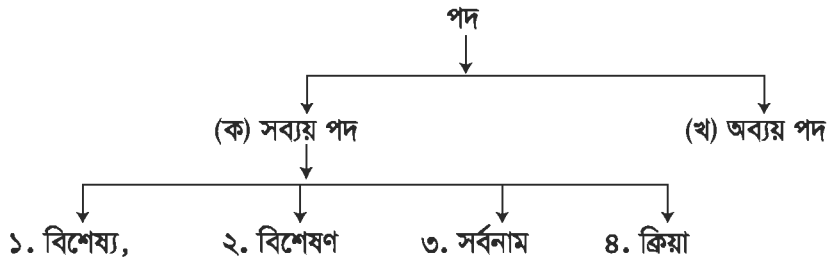
আলোচ্য বাক্যটিতে

১.	বিশেষ্য পদ	: অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ
২.	বিশেষণ পদ	: দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত
৩.	সর্বনাম পদ	: তাঁরা
৪.	ক্রিয়াপদ	: পৌঁছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া)
৫.	অব্যয় পদ	: এবং, জন্য

বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে **বিশেষ্য পদ** বলে।

বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের **বিশেষ্য পদ** বলে।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)

২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)

৩. বস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)

৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)

৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)

৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)

১. **সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য** : যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য বলে। যথা–

(ক) ব্যক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল

(খ) ভৌগোলিক স্থানের : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা

(গ) ভৌগোলিক সংজ্ঞা : (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি) মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর

(ঘ) গ্রন্থের নাম : 'গীতাঞ্জলি', 'অগ্নিবীণা', 'দেশে বিদেশে', 'বিশ্বনবি'

২. **জাতিবাচক বিশেষ্য** : যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ।

৩. **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য** : যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা– বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি।

৪. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** : যে পদে বেশকিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা–ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা– সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল।

৫. **ভাববাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা– গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা।

৬. **গুণবাচক বিশেষ্য** : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা–ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা–মধুর মিষ্টত্বের গুণ– মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ–তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ– তিক্ততা, তরুণের গুণ–তারুণ্য ইত্যাদি। তদ্রূপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

বিশেষণ পদ

বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে **বিশেষণ পদ** বলে।

চলন্ত গাড়ি : বিশেষ্যের বিশেষণ।

করুণাময় তুমি : সর্বনামের বিশেষণ।

দ্রুত চল : ক্রিয়া বিশেষণ।

বিশেষণ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ।

১. নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা–

বিশেষ্যের বিশেষণ : **সুস্থ সবল** দেহকে কে না ভালোবাসে?

সর্বনামের বিশেষণ : সে **রূপবান** ও **গুণবান**।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

ক. রূপবাচক : নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।

খ. গুণবাচক : চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া।

গ. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।

ঘ. সংখ্যাবাচক : হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।

ঙ. ক্রমবাচক : দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।

চ. পরিমাণবাচক : বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দু কিলোমিটার রাস্তা।

ছ. অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।

জ. উপাদানবাচক : বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি।

ঝ. প্রশ্নবাচক : কতদূর পথ? কেমন অবস্থা?

ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি

ক. ক্রিয়াজাত : হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।

খ. অব্যয়জাত : আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।

গ. সর্বনাম জাত : কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।

ঘ. সমাসসিদ্ধ : বেকার, নিয়ম–বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।

ঙ. বীপ্সামূলক : হাসিহাসি মুখ, কাঁদকাঁদ চেহারা, ডুবুডুবু নৌকা।

চ. অনুকার অব্যয়জাত : কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে।

ছ. কৃদন্ত : কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে–চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।

জ. তদ্ধিতান্ত : জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।

ঝ. উপসর্গযুক্ত : নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।

ঞ. বিদেশি : নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তনি তালুক।

২. ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা–ই ভাব বিশেষণ।

ভাব বিশেষণ চার প্রকার : ১. ক্রিয়া বিশেষণ ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।
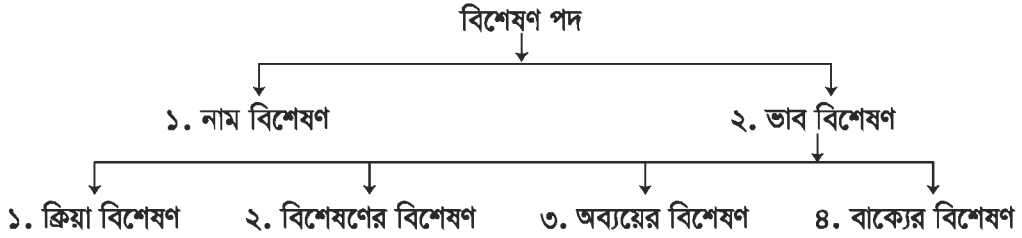
১. ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা–

ক. ক্রিয়া সংগঠনের ভাব : **ধীরে ধীরে** বায়ু বয়।

খ. ক্রিয়া সংগঠনের কাল : **পরে** একবার এসো।

২. **বিশেষণীয় বিশেষণ :** যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যথা–

ক. নাম বিশেষণের বিশেষণ : **সামান্য** একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে **অতিশয়** দুঃখিত।

খ. ক্রিয়া–বিশেষণের বিশেষণ : রকেট **অতি** দ্রুত চলে।

৩. **অব্যয়ের বিশেষণ :** যে ভাব–বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা– **ধিক্** তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন।

৪. **বাক্যের বিশেষণ :** কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যেমন–

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। **বাস্তবিকই** আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন– যমুনা একটি **দীর্ঘ** নদী, পদ্মা **দীর্ঘতর**, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের **দীর্ঘতম** নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য **বৃহত্তম**, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে **বৃহত্তর** এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা **ক্ষুদ্রতর**।

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যথা–

গরুর **থেকে** ঘোড়ার দাম বেশি।

বাঘের **চেয়ে** সিংহ বলবান।

২. **বহুর মধ্যে অতিশায়ন** : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা–

নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম **সবচেয়ে** বুদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে বিমলই **সবচাইতে** বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ **সর্বাপেক্ষা** বলবান।

৩. দুটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা–

পদ্মফুল গোলাপের চাইতে **অনেক** সুন্দর। ঘিয়ের চেয়ে দুধ **বেশি** উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলেবু **অল্প** ছোট।

৪. কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন– এ মাটি **সোনার** বাড়া।

খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন– গুরু–গুরুতর–গুরুতম। দীর্ঘ–দীর্ঘতর–দীর্ঘতম।

কিন্তু 'তর' প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শ্রুতিকটু হলে 'তর' প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে 'অধিকতর' শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন– অশ্ব হস্তী অপেক্ষা **অধিকতর** সুশ্রী।

২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন– মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স্' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন–

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়		বহুর তুলনায়
লঘু	লঘিয়ান	(বাংলায় ব্যবহার নেই)	লঘিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান		কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	জ্যায়ান		জ্যেষ্ঠ
শ্রেয়	শ্রেয়ান		শ্রেষ্ঠ।

উদাহরণ : তিন ভাইয়ের মধ্যে রহিমই **জ্যেষ্ঠ** এবং করিম **কনিষ্ঠ**। সংখ্যাগুলোর **লঘিষ্ঠ** সাধারণ গুণিতক বের কর।

৪. 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন– ভূয়সী প্রশংসা।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন –

ভালো	:	বিশেষণ রূপে	–	**ভালো** বাড়ি পাওয়া কঠিন।
		বিশেষ্য রূপে	–	আপন **ভালো** সবাই চায়।
মন্দ	:	বিশেষণ রূপে	–	**মন্দ** কথা বলতে নেই।
		বিশেষ্য রূপে	–	এখানে কী **মন্দটা** তুমি দেখলে?
পুণ্য	:	বিশেষণ রূপে	–	তোমার এ **পুণ্য** প্রচেষ্টা সফল হোক।
		বিশেষ্য রূপে	–	**পুণ্যে** মতি হোক।
নিশীথ	:	বিশেষণ রূপে	–	**নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি।
		বিশেষ্য রূপে	–	গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	:	বিশেষণ রূপে	–	**শীতকালে** কুয়াশা পড়ে।
		বিশেষ্য রূপে	–	**শীতের** সকালে চারদিক কুয়াশায় অন্ধকার।
সত্য	:	বিশেষণ রূপে	–	**সত্য** পথে থেকে **সত্য** কথা বল।
		বিশেষ্য রূপে	–	এ এক বিরাট **সত্য**।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে **সর্বনাম** পদ বলে।

সর্বনাম সাধারণত ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন– হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। **তার** শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।

দ্বিতীয় বাক্যে 'তার' শব্দটি প্রথম বাক্যের 'হস্তী' বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, 'তার' শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন–

ক. **যারা** দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, **তারাই** তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

খ. ধান ভানতে **যারা** শিবের গীত গায়, **তারা** স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।

(২) আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।

(৩) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।

(৪) দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব।

(৫) সাকুল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।

(৬) প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?

(৭) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।

(৮) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।

(৯) সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।

(১০) অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

১. ব্যক্তিবাচক	২. আত্মবাচক
৩. সামীপ্যবাচক	৪. দূরত্ববাচক
৫. সাকুল্যবাচক	৬. প্রশ্নবাচক
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	৮. ব্যতিহারিক
৯. সংযোগজ্ঞাপক	১০. অন্যাদিবাচক

সর্বনামের পুরুষ

‘পুরুষ’ একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার।

১. **উত্তম পুরুষ** : স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উত্তম পুরুষ।

২. **মধ্যম পুরুষ** : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

৩. **নাম পুরুষ :** অনুপস্থিত অথবা পরোভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের প্রভৃতি নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ্য শব্দই নাম পুরুষ)।
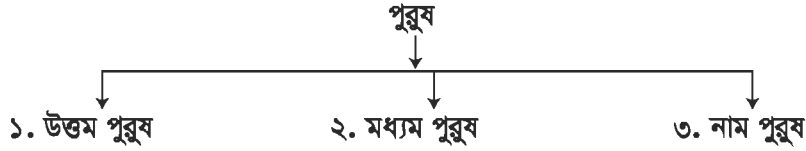
ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ

পুরুষভেদে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ

রূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; কবিতায় : মোর, মোরা	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সম্ভ্রমাত্মক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁদের, তাঁহাদের, তাঁহাদিগকে, তাঁদেরকে, তাঁহাকে, তাঁকে, ইনি, এঁর, এঁরা, ইঁহাদের, এঁদের, ইঁহাকে, এঁকে, উনি, ওঁর, ওঁরা, ওঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের

সর্বনামের বিভক্তিগ্রাহী রূপ : বাংলা সর্বনামসমূহ কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারকে বিভক্তিযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ বলা হয়।

কর্তৃকারকে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত একবচন ধরা হয়।

	কর্তৃকারকে প্রথমার একবচন		অন্যান্য কারকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ	
সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক
আমি				
তুমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তো
সে	তিনি		তাঁহা, তাঁ	তাহা, তা
যে	যিনি		যাঁহা, যাঁ	যাহা, যা
	ইনি	এ	ইঁহা, এঁ	ইহা, এ
	উনি	উহা	উঁহা, ওঁ	উহা, ও
কে, কি, কী		কে, কি, কী		কাহা, কা

জ্ঞাতব্য

১. চলিত ভাষায়–

(ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।

(খ) সম্ভ্রমার্থে এগুলোর সাথে একটি চন্দ্রবিন্দু সংযোজিত হয়। যথা– তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)। (সম্ভ্রমার্থে) তাঁহা + দের = তাঁহাদের (সাধু) > তাঁদের (চলিত)।

২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে র, এর বা কে বিভক্তি যোগ করে নিতে হয়। যেমন– তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দ্বারা, তার দ্বারা, আমাকে দিয়ে।

৩. ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ঈয়–প্রত্যয়যুক্ত সর্বনামজাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যথা : মৎ+ ঈয় = মদীয়, ভবৎ + ঈয় = ভবদীয়, তৎ+ ঈয় = তদীয়।

৪. 'কী' সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে 'কিসে' বা (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে) 'কীসের' রূপ গ্রহণ করে। যথা : কী + দ্বারা = কীসের দ্বারা, কী + থেকে = কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের একবচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা– 'আজ্ঞা কর **দাসে**, শাস্তি **নরাধমে**'। '**দীনের** আরজ'।

২. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত 'আমার' স্থানে মম, 'আমাদের' স্থানে মোদের এবং 'আমরা' স্থানে মোরা ব্যবহৃত হয়। যেমন – 'কে বুঝিবে ব্যথা **মম**'। '**মোদের** গরব, **মোদের** আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা'। 'ক্ষুদ্র শিশু **মোরা**, করি তোমারি বন্দনা'।

৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত 'আপনি' স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন– (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) 'প্রভু, **তুমি** রক্ষা কর এ দীন সেবকে।'

৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়।

৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই **অব্যয়**। অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে– বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. **বাংলা অব্যয় শব্দ** : আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।

২. **তৎসম অব্যয় শব্দ** : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

৩. **বিদেশি অব্যয় শব্দ** : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ

১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে : কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।

২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগে : ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।

৩. দুটি ভিন্ন শব্দযোগে : মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।

৪. অনুকার শব্দযোগে : কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার : ১. সমুচ্চয়ী, ২. অনন্বয়ী, ৩. অনুসর্গ, ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।
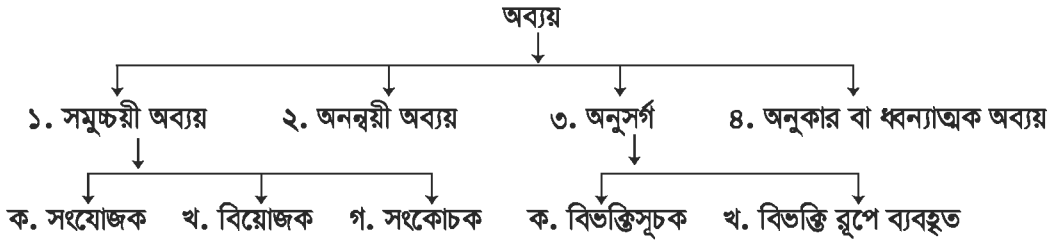
১. **সমুচ্চয়ী অব্যয়** : যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বা **সম্বন্ধবাচক অব্যয়** বলে।

ক. সংযোজক অব্যয়

(i) উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে 'ও' অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজন করছে।

(ii) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে 'তাই' অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে। আর, অধিকন্তু, সুতরাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়

(i) হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী।

এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।

(ii) 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক।

আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে 'কিন্তু' অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক।

বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে 'অথচ' অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে। তাই তাদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন–

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন **যে** তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

২. আজ **যদি** (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।

৩. এভাবে চেষ্টা করবে **যেন** কৃতকার্য হতে পার।

২. অনন্বয়ী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন–

ক.	উচ্ছ্বাস প্রকাশে	:	**মরি মরি!** কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!
খ.	স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে	:	**হ্যাঁ,** আমি যাব। না, আমি যাব না।
গ.	সম্মতি প্রকাশে	:	আমি আজ **আলবত** যাব। **নিশ্চয়ই** পারব।
ঘ.	অনুমোদনবাচকতায়	:	আপনি যখন বলছেন, **বেশ তো** আমি যাব।
ঙ.	সমর্থনসূচক জবাবে	:	আপনি যা জানেন তা **তো** ঠিকই বটে।
চ.	যন্ত্রণা প্রকাশে	:	**উঃ!** পায়ে বড্ড লেগেছে। **নাঃ!** এ কষ্ট অসহ্য।
ছ.	ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	:	**ছি ছি,** তুমি এত নীচ! **কী আপদ!** লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ.	সম্বোধনে	:	'**ওগো,** আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'
ঝ.	সম্ভাবনায় :		'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে **পাছে** লোকে কিছু বলে।'

ঞ. বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন–

১. **কত না** হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।

২. '**হায়রে** ভাগ্য, **হায়রে** লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা– ওকে **দিয়ে** এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।

অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী অব্যয়' নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার : ক. বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা–

বজ্রের ধ্বনি– কড় কড়	মেঘের গর্জন – গুড় গুড়
বৃষ্টির তুমুল শব্দ – ঝম ঝম	সিংহের গর্জন – গর গর
স্রোতের ধ্বনি – কল কল	ঘোড়ার ডাক – চিঁহি চিঁহি
বাতাসের গতি – শন শন	কাকের ডাক– কা কা
শুষ্ক পাতার শব্দ – মর মর	কোকিলের রব – কুহু কুহু
নূপুরের আওয়াজ – রুম ঝুম	চুড়ির শব্দ – টুং টাং

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যথা–

ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

ক. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হলে নাম–বিশেষণ, ক্রিয়া–বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা–

নাম–বিশেষণ : **অতি** ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ভাব–বিশেষণ : **আবার** যেতে হবে।

ক্রিয়া–বিশেষণ : **অন্যত্র** চলে যায়।

খ. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা–তথা, যত–তত, যখন–তখন, যেমন–তেমন, যেরূপ–সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণ–যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

গ. ত (সংস্কৃত তস্) **প্রত্যয়ান্ত অব্যয় :** এরকম তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যথা – **ধর্মত** বলছি। **দুর্ভাগ্যবশত** পরীক্ষায় ফেল করেছি। **অন্তত** তোমার যাওয়া উচিত। **জ্ঞানত** মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. **আর** – পুনরাবৃত্তি অর্থে	:	ও দিকে আর যাব না।
নির্দেশ অর্থে	:	বল, আর কী চাও?
নিরাশায়	:	সে দিন কি আর আসবে?
বাক্যালংকারে	:	আর কি বাজবে বাঁশি?

২. ও – সংযোগ অর্থে	:	করিম ও রহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায়	:	আজ বৃষ্টি হতেও পারে।
তুলনায়	:	ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে	:	খেতে যাবে? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে	:	এত চেষ্টাতেও হলো না।
৩. কি/কী–জিজ্ঞাসায়	:	'তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
বিরক্তি প্রকাশে	:	কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সাকুল্য অর্থে	:	কি আমীর কি ফকির, একদিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে	:	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।
৪. না–নিষেধ অর্থে	:	এখন যেও না।
বিকল্প প্রকাশে	:	তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
আদর প্রকাশে বা অনুরোধে	:	আর একটি মিষ্টি খাও না খোকা। আর একটা গান গাও না।
সম্ভাবনায়	:	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
বিস্ময়ে	:	কী করেই না দিন কাটাচ্ছ!
তুলনায়	:	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।
৫. যেন – উপমায়	:	মুখ যেন পদ্মফুল।
প্রার্থনায়	:	খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
তুলনায়	:	ইস্, ঠান্ডা যেন বরফ।
অনুমানে	:	লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
সতর্কীকরণে	:	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
ব্যঙ্গ প্রকাশে	:	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উত্তরের মধ্যে সর্বোত্তম উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(i) পদ কয় প্রকার?

ক. চার   গ. ছয়

খ. পাঁচ   ঘ. সাত

(ii) বিশেষ্য পদ কয় প্রকার?

ক. তিন — গ. পাঁচ

খ. চার — ঘ. ছয়

(iii) ভাববিশেষণ কয় প্রকার ?

ক. দুই — গ. চার

খ. তিন — ঘ. পাঁচ

(iv) সর্বনাম পদ কয় প্রকার?

ক. দশ — গ. আট

খ. নয় — ঘ. সাত

(v) অব্যয় পদ কয় প্রকার?

ক. তিন — গ. পাঁচ

খ. চার — ঘ. ছয়

(vi) কোনটি সংযোগজ্ঞাপক সর্বনাম?

ক. যারা–তারা — গ. এরা

খ. তোরা — ঘ. কারা

(vii) কোন বাক্যে বিশেষণের বিশেষণ রয়েছে?

ক. ধীরে চল — গ. ঘোড়া খুব দ্রুত চলে

খ. সে গুণবান — ঘ. মেটে কলসি

(viii) কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য?

ক. ভোজন — খ. চিনি

খ. সৌরভ — ঘ. জনতা

(ix) কোনটিতে বস্তুবাচক বিশেষ্য রয়েছে?

ক. সবুজ মাঠ — গ. বেলে মাটি

খ. তাজা মাছ — ঘ. অর্ধেক পথ

(x) কোন বাক্যের মোটা অক্ষরটি অনন্বয়ী অব্যয়?

ক. তাকে **দিয়ে** এ কাজ হবে না। — গ. তুমি ভালো ছাত্র **তাই** তোমাকে সবাই ভালোবাসে।

খ. বৃষ্টি পড়ে **ঝমঝম**। — ঘ. **উঃ** বড্ড লেগেছে।

২। পদ বলতে কী বোঝ? পদ প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে?

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে যে সমস্ত বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো প্রকারভেদ অনুসারে সাজাও।

ক. নজরুল বাংলাদেশের চিরস্মরণীয় কবি।

খ. তাঁর কাব্য প্রতিভা জাতিকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছে।

গ. ‘ঠোকাঠুকি লেগে গেল বরগাকড়িতে।’

ঘ. ‘জীবন, যৌবন, বল সকলই ঘুচায় কাল, আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।’

৪। নাম বিশেষণকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি? প্রত্যেকটি ভাগের উদাহরণ দাও।

৫। নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক, প্রশ্নবাচক, নাম বিশেষণের উদাহরণ দাও।

৬। ক্রিয়া, অব্যয় ও সর্বনামজাত বিশেষণ পদের উদাহরণ দাও এবং বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৭। ‘বিশেষণের অতিশায়ন’ বলতে কী বোঝ? খাঁটি বাংলা বিশেষণ শব্দের অতিশায়নের বিষয়সমূহ বিশদ আলোচনা কর।

৮। বাক্যগঠনে অতিশায়নের ভুল থাকলে শুদ্ধ কর।

মেঘনা বাংলাদেশের অধিকতম দীর্ঘতর নদী। হস্তী অশ্ব অপেক্ষা বলবত্তর। সভায় তার ভূয়াসন প্রশংসা হয়েছিল। ভাইদের মধ্যে মুমিনই সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণতম।

৯। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বনামের সম্ভ্রমাত্মক রূপটি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

১০। ‘তুই’ ও ‘তুমি’ সর্বনামের ব্যবহারবিধি লেখ।

১১। স্বরচিত বাক্যে উদাহরণ দাও।

সংকোচন অব্যয়, সম্ভাবনা ও সম্মতি প্রকাশে অনন্বয়ী অব্যয়, অনুভূতিগ্রাহ্য অনুকার অব্যয়।

১২। বিভিন্ন অর্থে ‘ও’ এবং ‘না’ অব্যয়ের ব্যবহার দেখাও।

১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদ রূপে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

ধনী, সাধু, কাল, মধু, সুন্দর, গোলাপ, পুণ্য

১৪। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

ভাববাচক, বিশেষ্য, বিশেষণ, রূপবাচক বিশেষণ, দূরত্বজ্ঞাপক সর্বনাম, অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয়, সমুচ্চয়ী অব্যয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রিয়াপদ

১. কবির বই **পড়ছে**।

২. তোমরা আগামী বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে।

'পড়ছে' এবং **'দেবে'** পদ দুটো দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝাচ্ছে বলে এরা **ক্রিয়াপদ**।

যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ওপরের প্রথম উদাহরণে নাম পুরুষ 'কবির' কর্তৃক বর্তমান কালে 'পড়া' কার্যের সংঘটন প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় উদাহরণে মধ্যম পুরুষ, 'তোমরা' ভবিষ্যৎ ক্রিয়া সংঘটনের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে।

ক্রিয়াপদের গঠন : ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। যেমন–

'পড়ছে' – পড় 'ধাতু' + 'ছে' বিভক্তি।

অনুক্ত ক্রিয়াপদ : ক্রিয়াপদ বাক্যগঠনের অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোনো মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। তবে কখনো কখনো বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুক্ত থাকতে পারে। যেমন–

ইনি আমার ভাই = ইনি আমার ভাই (হন)।

আজ প্রচণ্ড গরম = আজ প্রচণ্ড গরম (অনুভূত হচ্ছে)।

তোমার মা কেমন? = তোমার মা কেমন (আছেন)?

বাক্যে সাধারণত **'হ্'** এবং 'আছ' ধাতু গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিবিধ অর্থে ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়–ক সমাপিকা ক্রিয়া, এবং খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয়, তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন – ছেলেরা খেলা **করছে**। এ বছর বন্যায় ফসলের ক্ষতি **হয়েছে**।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন–

১. প্রভাতে সূর্য **উঠলে** ....

২. আমরা হাত–মুখ **ধুয়ে** ....

৩. আমরা বিকেলে **খেলতে** ....

এখানে, 'উঠলে' ' ধুয়ে' এবং 'খেলতে' ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এ শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।

উপর্যুক্ত বাক্যগুলো পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন করলে দাঁড়াবে–

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে অন্ধকার দূর হয়।

২. আমরা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম।

৩. আমরা বিকেলে খেলতে যাই।

পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ইয়া (পড়িয়া), ইলে (পড়িলে), ইতে (পড়িতে),এ (পড়ে), লে (পড়লে), তে (পড়তে) বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়া।
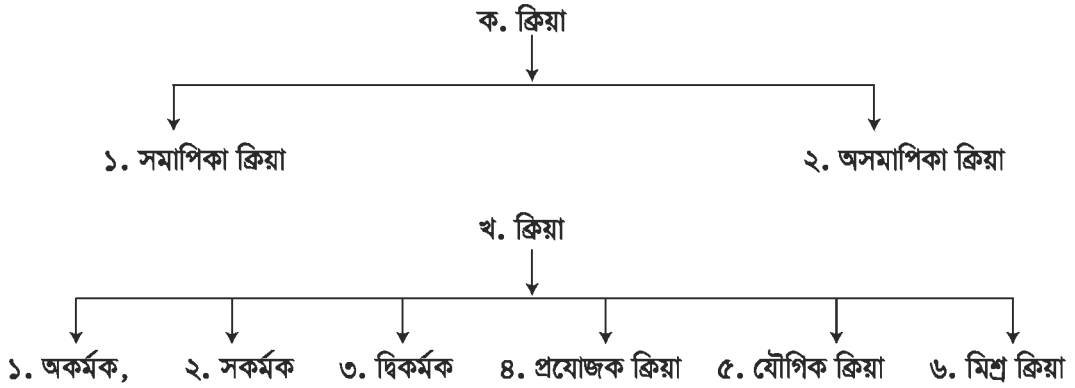
২. সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা–ই **সকর্মক ক্রিয়া**। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা–ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন–বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন? উত্তর : কলম (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন? উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

'দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা **অকর্মক ক্রিয়া**। যেমন–মেয়েটি হাসে। 'কী হাসে' বা 'কাকে হাসে' প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই 'হাসে' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে **মুখ্য** বা **প্রধান কর্ম** এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে **গৌণ কর্ম** বলে। বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন বাক্যে 'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে **সমধাতুজ কর্ম** বা

ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন– আর কত খেলা খেলবে। মূল 'খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই 'খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন–

এমন সুখের **মরণ** কে মরতে পারে?

বেশ এক **ঘুম** ঘুমিয়েছি।

আর **মায়াকান্না** কেঁদো না গো বাপু।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ : প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হতে পারে। যেমন–

অকর্মক	**সকর্মক**
আমি চোখে দেখি না।	আকাশে চাঁদ দেখি না।
ছেলেটা কানে শোনে না।	ছেলেটা কথা শোনে।
আমি রাতে খাব না।	আমি রাতে ভাত খাব না।
অন্ধকারে আমার খুব ভয় করে।	বাবাকে আমার খুব ভয় করে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক **ক্রিয়া** বলে। (সংস্কৃত ব্যাকরণে একে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়)

প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন–

প্রযোজক কর্তা	**প্রযোজ্য কর্তা**	**প্রযোজক ক্রিয়া**
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন।
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না।
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়।

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু+ আ। যেমন মূল ধাতু √হাস্ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা +চ্ছেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া–বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন–

ক. বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নামধাতু)। যথা–
শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)। যথা–
কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

গ. ধ্বনাত্মক অব্যয় : কন কন –দাঁতটি ব্যথায় **কনকনাচ্ছে**। ফোঁস – অজগরটি **ফোঁসাচ্ছে**।

আ–প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ফল– বাগানে বেশ কিছু লিচু **ফলেছে**।

টক – তরকারি বাসি হলে **টকে**।

ছাপা– আমার বন্ধু বইটা **ছেপেছে**।

৫। **যৌগিক ক্রিয়া :** একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে **যৌগিক ক্রিয়া** বলে। যেমন–

ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা **শুনে রাখ**।

খ. নিরন্তরতা অর্থে : তিনি **বলতে লাগলেন**।

গ. কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা **শুয়ে পড়ল**।

ঘ. আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন **বেজে উঠল**।

ঙ. অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত **হয়ে থাকে**।

চ. অনুমোদন অর্থে : এখন **যেতে পার**।

৬। **মিশ্র ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়, ধর্, মার্, প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

ক. বিশেষ্যের উত্তর (পরে) : আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম**। এখন **গোল্লায় যাও**।

খ. বিশেষণের উত্তর (পরে) : তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত** হলাম।

গ. ধ্বনাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে) : মাথা **ঝিম ঝিম্ করছে**। ঝম্ ঝম্ করে **বৃষ্টি পড়ছে**।

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

১. সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

২. এখন বাড়ি যাও।

৩. সে পড়লে পাশ করত।

৪. তোমার কল্যাণ হোক।

ওপরের বাক্যগুলোতে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধরন বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।

ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার

১. নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)

২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)

৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)

৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব (Optative Mood)

১. **নির্দেশক ভাব :** সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব হয়। যথা–

ক. সাধারণ নির্দেশক : আমরা বই পড়ি। তারা বাড়ি যাবে।

খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় : আপনি কি আসবেন? সে কি গিয়েছিল?

২. **অনুজ্ঞা ভাব :** আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন–

ক. আদেশাত্মক	: বর্তমান কালে	–	চুপ কর।
	: ভবিষ্যৎ কালে	–	তুমি কাল যেও।
খ. নিষেধাত্মক	: বর্তমান কালে	–	অন্যায় কাজ করো না।
	: ভবিষ্যৎ কালে	–	মিথ্যা বলবে না।
গ. অনুরোধসূচক	: বর্তমান কালে	–	ছাতাটা দিন তো ভাই।
	: ভবিষ্যৎ কালে	–	আপনারা আসবেন।
ঘ. উপদেশাত্মক	: বর্তমানে কালে	–	মন দিয়ে পড়।
	: ভবিষ্যৎ কালে	–	স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

৩. সাপেক্ষ ভাব : একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন–

ক. সম্ভাবনায় : তিনি ফিরে এলে সবকিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে পড়ত তবে পাশ করত।

খ. উদ্দেশ্য বোঝাতে : ভালো করে পড়লে সফল হবে।

গ. ইচ্ছা বা কামনায় : আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না।

৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব : যে ক্রিয়াপদে বক্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন–সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

অনুশীলনী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হয়েছে। ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(i) কোন বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম রয়েছে?

ক. আমি ঘুম থেকে জেগেছি। খ. আমি বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

গ. আমি বেশ ঘুম দিয়েছি। ঘ. তোমার ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

(ii) কোনটি মিশ্র ক্রিয়া?

ক. গোল্লায় যাও। খ. কনকনাচ্ছে।

গ. বেজে ওঠা। ঘ. দেখাচ্ছেন।

(iii) কোন বাক্যটি অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশ করছে?

ক. আমি বাড়ি যাই। খ. মন দিয়ে লেখাপড়া কর।

গ. পরিশ্রম করলে সফল হবে। ঘ. তার মঙ্গল হোক।

(iv) কোন বাক্যটিতে নামধাতুর ক্রিয়াপদ রয়েছে?

ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। খ. আমরা কুতুবমিনার দর্শন করলাম।

গ. শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন। ঘ. তুমি যেতে পার।

(v) কোন বাক্যটি সাপেক্ষ ভাব প্রকাশ করছে?

ক. আমাকে বই দাও। খ. যদি সে যেত, আমি আসতাম।

গ. তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। ঘ. রেবা ভালো গান করে।

(vi) কোন বাক্যটিতে যৌগিক ক্রিয়াপদ রয়েছে?

ক. তুমি এখন গান করতে পার। খ. আমি এইমাত্র এলাম।

গ. শিক্ষক মহোদয় বাংলা পড়াচ্ছেন। ঘ. হামিদকে দেখে খুশি হলাম।

(vii) কোন বাক্যটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

ক. চল খেলতে যাই। খ. আর মায়াকান্না কেঁদো না।

গ. আমাকে বইটা দাও। ঘ. সাপুড়ে সাপ খেলায়।

(viii) কোন বাক্যটির ক্রিয়া সকর্মক?

ক. চুপ করে থাক। খ. আকাশের চাঁদ যেন মাটিতে নেমেছে।

গ. আকাশে চাঁদ উঠেছে। ঘ. শিশুটি কাঁদে।

(ix) কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

ক. মাথা ঝিম ঝিম করছে। খ. তোমার পরিশ্রমের ফল ফলেছে।

গ. মা শিশুটিকে হাসান। ঘ. শিশুটি কাঁদে।

(x) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া আছে?

ক. এ নদীতে প্রচুর মাছ আছে। খ. আমরা হাত–মুখ ধুয়ে বেড়াতে বের হব।

গ. রূপকথার গল্প শোন। ঘ. তুমি কোথায় যাচ্ছ?

২। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।

৩। বাংলা বাক্য গঠনে কোন কোন ধাতুগঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে? উদাহরণ দাও।

৪। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ সহযোগে বিশদ ব্যাখ্যা কর।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে বলা হয় ...... এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে বলা হয় ....।

খ. বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একটি থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে বলা হয় ....।

৬। প্রযোজক ক্রিয়া এবং নামধাতু ক্রিয়াপদের উদাহরণ দাও।

৭। যৌগিক ক্রিয়া কাকে বলে? যৌগিক ও মিশ্র ক্রিয়ার পার্থক্য লেখ।

৮। যৌগিক ক্রিয়া গঠনের উপায় কী? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৯। 'ক্রিয়ার ভাব' বলতে কী বোঝ? বাক্য গঠন করে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়াপদের তিনটি উদাহরণ দাও।

১০। 'আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব' বলতে কী বোঝ? বাক্য গঠন করে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের প্রয়োগ দেখাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাল : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

১. আমরা বই পড়ি। 'পড়া' ক্রিয়াটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।

২. কাল তুমি শহরে **গিয়েছিলে**। 'যাওয়া' ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আগামীকাল স্কুল **বন্ধ থাকবে**। 'বন্ধ থাকা' কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

সুতরাং, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।

এ হিসেবে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার : ১. বর্তমান কাল, ২. অতীত কাল এবং ৩. ভবিষ্যৎ কাল।

ক্রিয়াপদ : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল সময় ও পুরুষ জ্ঞাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

আমি **যাই**। তুমি **যাও**। আপনি যান। সে **যায়**। তিনি **যান**।

(সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।)

খ. বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যথা–

আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা) যান। সে (বা তারা) যায়। তিনি (বা তাঁরা) যান।

গ. সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক, তুচ্ছার্থকভেদে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে (উত্তম পুরুষে হয় না)। যেমন –

	সাধারণ	**সম্ভ্রমাত্মক**	**তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক**
উত্তম পুরুষ	আমি যাই	--	--
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও	আপনি যান	তুই যা
	তোমরা যাও	আপনারা যান	তোরা যা
নাম পুরুষ	সে যায়	তিনি যান	এটা যায়
	তারা যায়	তাঁরা যান	এগুলো যায়।

কালের প্রকারভেদ

ক্রিয়া সংঘটনের প্রধান কাল বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. **বর্তমান কাল** : ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান

খ. ঘটমান বর্তমান

গ. পুরাঘটিত বর্তমান

২. অতীত কাল : ক. সাধারণ অতীত
খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত
ঘ. পুরাঘটিত অতীত।

৩. ভবিষ্যৎ কাল : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ
খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ
গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

বর্তমান কাল

১. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ **বর্তমান কাল** বলে। যেমন– সে ভাত খায়। আমি বাড়ি **যাই**।

ক. নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যথা–

সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। (স্বাভাবিকতা)
আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। (অভ্যস্ততা)

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ।

(১) **স্থায়ী সত্য প্রকাশে** : চার আর তিনে সাত **হয়**।

(২) **ঐতিহাসিক বর্তমান** : অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে **ঐতিহাসিক বর্তমান** কাল বলে।
যেমন–
বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে **আরোহণ করেন**।

(৩) **কাব্যের ভণিতায়** : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস **ভনে শুনে** পুণ্যবান।

(৪) **অনিশ্চয়তা প্রকাশে** : কে জানে দেশে আবার সুদিন **আসবে** কি না।

(৫) 'যদি', 'যখন', 'যেন' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন–

বৃষ্টি যদি **আসে**, আমি বাড়ি চলে যাব।

সকলেই যেন সভায় হাজির **থাকে**।

বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই **আসে**।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) : এখন **তবে** আসি।

(২) প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চণ্ডীদাস **বলেন**, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

(৩) বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি **দেখেছি,** বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।

(৪) 'নেই', 'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে **যাননি**।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা–হাসান বই **পড়ছে**। নীরা গান **গাইছে**।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা–বক্তা বললেন, "শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন–সম্পদ **লুণ্ঠিত হচ্ছে**, দিকে দিকে আগুন **জ্বলছে**।"

(২) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই **আসছি**।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** ব্যবহৃত হয়। যেমন–

এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**।

এতক্ষণ আমি অঙ্ক **করেছি**।

অতীত কাল

১. সাধারণ অতীত : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন–

প্রদীপ নিভে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

(১) পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : 'এক্ষণে **জানিলাম**, কুসুমে কীট আছে।'

(২) বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় **হলাম**।

২. নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে **নিত্যবৃত্ত অতীত কাল** বলে । যেমন–

আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমণ **করতাম**।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

(১) কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন **আসত**, কেমন মজা **হতো**।

(২) অসম্ভব কল্পনায় : 'সাতাশ **হতো** যদি একশ সাতাশ'।

(৩) সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি **যেতে**, তবে ভালোই **হতো**।

৩. ঘটমান অতীত কাল : অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি–ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে **ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল** হয়। যেমন–

কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই **পড়ছিলাম**। বাবা আমাদের পড়াশুনা **দেখছিলেন**।

৪. পুরাঘটিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলা হয়। যেমন–

সেবার তাকে সুস্থই **দেখেছিলাম**। কাজটি কি তুমি **করেছিলে?**

(ক) অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা **গিয়েছিল**।

আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ **দিয়েছিলাম**।

(খ) অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে **পুরাঘটিত অতীত কালের** প্রয়োগ হয়। যেমন– বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি **পৌঁছেছিলাম**।

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যথা–

আমরা মাঠে খেলতে **যাব**।

শীঘ্রই বৃষ্টি **আসবে**।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন–কে জানত, আমার ভাগ্য এমন **হবে?** সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি **বাজবে?**

(২) অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন – ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন**। তোমরা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে**।

১. ঘটমান ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ

নাম পুরুষ সাধারণ : –ইতে থাকিবে/–তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ : –ইতে থাকিবেন/–তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

(সম্ভ্রমাত্মক)

মধ্যম পুরুষ সাধারণ : –ইতে থাকিবে/–তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক : –ইতে থাকিবে/–তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

উত্তম পুরুষ : –ইতে থাকিব/–তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।)

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ** বলে।

লক্ষ করার বিষয়, এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার –ইতে / –তে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক্ ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য : মূল ধাতুর সঙ্গে –ইতে/তে–বিভক্তি যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভক্তিই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

২. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** কাল হয়।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি–ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক্ ও গম্ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে **যৌগিক ক্রিয়াপদ** তৈরি হয়। যথা – গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

(i) কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
- ক. আমরা গিয়েছি
- খ. তুমি যেতে থাক
- গ. সে কি গিয়েছিল?
- ঘ. সেখানে গিয়ে দেখে এসো

(ii) কোন বাক্যটি ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?
- ক. এ কথা জানতে তুমি
- খ. 'দেখে এলাম তারে'
- গ. কে যেন আসছে
- ঘ. 'আবার আসিব ফিরে'

(iii) কোন বাক্যটি ঐতিহাসিক বর্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত?
- ক. আমি রোজ স্কুলে যাই
- খ. বাবরের পর হুমায়ুন বাদশা হন
- গ. কেন যে তুমি আস না
- ঘ. রোজ দেরি হয় কেন?

(iv) সে হয়তো 'এসে থাকবে'–এখানে কোন কালের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
- ক. পুরাঘটিত বর্তমান
- খ. ঘটমান অতীত
- গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
- ঘ. সাধারণ অতীত

(v) কাজ শেষ করার জন্য সে আদাজল 'খেয়ে লেগেছে'–এখানে ক্রিয়া পদটির কাল হচ্ছে–
- ক. সাধারণ বর্তমান
- খ. ঘটমান বর্তমান
- গ. পুরাঘটিত বর্তমান
- ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান

(vi) 'সাতাশ 'হত' যদি একশ সাতাশ'–এখানে 'হত' কোন কালের ক্রিয়া?
ক. পুরাঘটিত অতীত
খ. পুরাঘটিত বর্তমান
গ. সাধারণ অতীত
ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত

(vii) ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাক্যটি কোন কালের?
ক. সাধারণ বর্তমান
খ. নিত্যবৃত্ত বর্তমান
গ. পুরাঘটিত অতীত
ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান

(viii) তিনি গতকাল ঢাকা 'যান' নি–ক্রিয়াটি কোন কালের?
ক. পুরাঘটিত বর্তমান
খ. সাধারণ বর্তমান
গ. পুরাঘটিত অতীত
ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান

(ix) কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীতের উদাহরণ?
ক. আমি রোজ সকালে বেড়াই
খ. আমি রোজ বেড়াতে যাব
গ. তোমাকে রোজ যেতে হবে
ঘ. আমি রোজ স্কুলে যেতাম

(x) কোনটি পুরাঘটিত বর্তমানের উদাহরণ?
ক. আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে থাকি
খ. আমি কথা কইব না
গ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছিলাম
ঘ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছি

২। 'কাল' বলতে কী বোঝায়? ক্রিয়ার কাল প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত? তাদের নাম লেখ।

৩। 'পুরুষ ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।'–উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

৪। 'পুরুষভেদে ক্রিয়ার প্রয়োগে বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভেদে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।'– উদাহরণ সহযোগে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৫। স্বরচিত বাক্যে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের চারটি বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে কী কী অর্থে বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ হয়েছে তা নির্দেশ কর।

ক. 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি।'

খ. 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।'

গ. 'চিন্তার কারণ নেই, কালই তাকে মজা দেখাচ্ছি।'

ঘ. সে গত মাসেও কাজে যোগদান করেনি।

ঙ. 'এতক্ষণে বুঝিলাম, প্রীতির উৎস পার্থিব সম্পদ।'

৭। নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে চারটি বাক্য রচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা ও উদাহরণ 'ক্রিয়াপদ' সম্পর্কে আলোচনা (চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) দেওয়া হয়েছে। এখানে সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হবে।

সমাপিকা ক্রিয়া

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা–

আনোয়ার বই পড়ে। (ক্রিয়া – সকর্মক, কাল – বর্তমান)।

মাসুদ সারাদিন খেলেছিল। (ক্রিয়া – অকর্মক, কাল – অতীত)।

আমি তোমাকে একটি কলম উপহার দেব। (ক্রিয়া – দ্বিকর্মক, কাল–ভবিষ্যৎ)।

অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ–ইয়া (য়ে), –ইতে (তে) অথবা –ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন – **যত্ন করলে** রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে **নিয়ে আসতে** চেষ্টা করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা

অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে একাধিক প্রকার কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায়–

১. **এক কর্তা** : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পারে। যথা – তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? 'পেলে' (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং 'আসবে' (সমাপিকা ক্রিয়া) উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে 'তুমি'।

২. **অসমান কর্তা** : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে **অসমান কর্তা** বলা হয়। যেমন–

ক. **শর্তাধীন কর্তা** : এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। উদাহরণ – তোমরা বাড়ি **এলে** আমি রওনা **হব**। এখানে 'এলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'তোমরা' এবং 'রওনা হব' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'আমি'। তোমাদের বাড়ি আসার ওপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শর্তাধীন।

খ. **নিরপেক্ষ কর্তা :** শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় **নিরপেক্ষ কর্তা**। যেমন – সূর্য অস্তমিত **হলে** যাত্রীদল পথ চলা **শুরু করল**। এখানে 'যাত্রীদের' পথ চলার সঙ্গে 'সূর্য' অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে 'সূর্য' নিরপেক্ষ কর্তা।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. 'ইলে' > 'লে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতে	:	চারটা **বাজলে** স্কুলের ছুটি হবে।
খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় জ্ঞাপনে	:	একবার **মরলে** কি কেউ ফেরে?
গ. সম্ভাব্যতা অর্থে	:	এখন বৃষ্টি **হলে** ফসলের ক্ষতি হবে।
ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে	:	তিনি **গেলে** কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে	:	'**জন্মিলে** মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'
চ. বিধিনির্দেশে	:	এখানে প্রচারপত্র **লাগালে** ফৌজদারিতে সোপর্দ হবে।
ছ. সম্ভাবনার বিকল্পে	:	আজ **গেলেও** যা, কাল **গেলেও** তা।
জ. পরিণতি বোঝাতে	:	বৃষ্টিতে **ভিজলে** সর্দি হবে।

২. 'ইয়া' > 'এ' বিভক্তি যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে	:	হাত–মুখ **ধুয়ে পড়তে** বস।
খ. হেতু অর্থে	:	ছেলেটি কুসঙ্গে **মিশে** নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে	:	**চেঁচিয়ে** কথা বলো না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে	:	'হৃদয়ের কথা **কহিয়া কহিয়া গাহিয়া** গান।'
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে	:	সেখানে আর **গিয়ে** কাজ নেই।
চ. অব্যয় পদের অনুরূপ	:	ঢাকা **গিয়ে** বাড়ি যাব।

৩. 'ইতে' >'তে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. ইচ্ছা প্রকাশে	:	এখন আমি **যেতে** চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে	:	মেলা **দেখতে** ঢাকা যাব।
গ. সামর্থ্য বোঝাতে	:	খোকা এখন **হাঁটতে** পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতে	:	বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস **করতে** হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থে	:	রমলা **গাইতে** জানে।
চ. আবশ্যকতা বোঝাতে	:	এখন ট্রেন **ধরতে** হবে।

ছ. সূচনা বোঝাতে : রানি এখন ইংরেজি **পড়তে** শিখেছে।

জ. বিশেষণবাচকতায় : লোকটাকে **দৌড়াতে** দেখলাম।

ঝ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে **থাকতে** দেখিনি।

ঞ. অনুসর্গরূপে : 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের **চাইতে** শ্যামল।'

ট. বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : '**দেখিতে** বাসনা মাগো তোমার চরণ।'

ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : **পদ্মফুল দেখতে** সুন্দর।

৪. **'ইতে' > 'তে' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ**

ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : '**কাটিতে কাটিতে** ধান এলো বরষা।'

খ. সমকাল বোঝাতে : 'সেঁউতিতে পদ দেবী **রাখিতে রাখিতে**।
সেঁউতি হইল সোনা '**দেখিতে দেখিতে**'।

টীকা : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পারে। যেমন– গরু **মেরে** জুতা দান। আঙ্গুল **ফুলে** কলাগাছ।

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার গঠন বিধি : অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়, দেখ্, লাগ্, ফেল্, আস্, উঠ্, দে, লহ্, থাক্, প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে, এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

১. **যা–ধাতু**

ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃষ্টি **থেমে গেল**।

খ. অবিরাম অর্থে : গায়ক **গেয়ে যাচ্ছেন**।

গ. ক্রমশ অর্থে : চা **জুড়িয়ে যাচ্ছে**।

ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : এখন যাওয়া **যেতে পারে**।

২. **পড়–ধাতু**

ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন **শুয়ে পড়**।

খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা **ছড়িয়ে পড়েছে**।

গ. আকস্মিকতা অর্থে : এখনই তুফান **এসে পড়বে**।

ঘ. ক্রমশ অর্থে : কেমন যেন মনমরা **হয়ে পড়েছি**।

৩. **দেখ্‌–ধাতু**

ক. মনোযোগ আকর্ষণে : এদিকে **চেয়ে দেখ**।

খ. পরীক্ষা অর্থে : লবণটা **চেখে দেখ**।

গ. ফল সম্ভাবনায় : সাহেবকে **বলে দেখ**।

৪. **আস্‌–ধাতু**

ক. সম্ভাবনায় : আজ বিকেলে বৃষ্টি **আসতে পারে**।

খ. অভ্যস্ততায় : আমরা এ কাজই **করে আসছি**।

গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : **ছুটি ফুরিয়ে আসছে**।

৫. **দি–ধাতু**

ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে **যেতে দাও**।

খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষ **করে দিলাম**।

গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অঙ্কটা **বুঝিয়ে দাও**।

৬. **নি–ধাতু**

ক. নির্দেশ জ্ঞাপনে : এবার কাপড়–চোপড় **গুছিয়ে নাও**।

খ. পরীক্ষা অর্থে : কষ্টি পাথরে সোনাটা **কষে নাও**।

৭. **ফেল্‌–ধাতু**

ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : সন্দেশগুলো **খেয়ে ফেল**।

খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা **হেসে ফেলল**।

৮. **উঠ্‌–ধাতু**

ক. ক্রমান্বয়তা বোঝাতে : ঋণের বোঝা ভারী **হয়ে উঠছে**।

খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি **রেগে ওঠেন**।

গ. আকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাৎ **চেঁচিয়ে উঠল**।

ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : আমার আর থাকা **হয়ে উঠল** না।

ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য **হয়ে ওঠে** না।

৯. **লাগ্‌–ধাতু**

ক. অবিরাম অর্থে : খোকা **কাঁদতে লাগল**।

খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে **লাগ** তো দেখি।

১০. থাক্‌–ধাতু

ক. নিরন্তরতা অর্থে : এবার **ভাবতে থাক**।

খ. সম্ভাবনায় : তিনি হয়তো **বলে থাকবেন**।

গ. সন্দেহ প্রকাশে : সে–ই কাজটা **করে থাকবে**।

ঘ. নির্দেশে : আর দরকার নেই, এবার **বসে থাক**।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

(i) কোন বাক্যের ক্রিয়াটি সম্ভাবনা প্রকাশ করছে?

ক. বৃষ্টি থেমে গেল
গ. তাড়াতাড়ি চল, বৃষ্টি আসতে পারে
খ. এক্ষুণি বৃষ্টি এসে পড়বে
ঘ. সে গান করতে পারে।

(ii) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. জন্মভূমি স্বর্গের চাইতে শ্রেষ্ঠ
গ. এমন চাওয়া চাইতে নেই
খ. সে আমার দিকে চাইতে থাকে
ঘ. কী চাইতে ইচ্ছা করে?

(iii) কোন বাক্যে অসমান কর্তা আছে?

ক. সে যেতে যেতে থেমে গেল
গ. সে কেঁদে কেঁদে বলল
খ. বালিকাটি গান করে চলে গেল
ঘ. সে এলে আমি যাব।

(iv) কোন বাক্যের কর্তা নিরপেক্ষ?

ক. আকাশে চাঁদ উঠলে আড্ডা ভাঙে
গ. বৃষ্টিতে ভিজলে কেন, সর্দি হবে
খ. বৃষ্টি হয়েছে তাই আমরা যাব না
ঘ. তুমি যদি যাও, সে যাবে।

(v) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তুমি কি এখন যাবে?
গ. 'জন্মিলে মরিতে হবে।'
খ. মরলে কি কেউ ফেরে?
ঘ. আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।

(vi) কোন বাক্যে আবশ্যকতা বোঝাতে ইতে > তে বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তোমাকে দেখতে চাই
গ. খোকা এখন পড়তে পারে
খ. আমি এখানে থাকতে আসিনি
ঘ. এখন ট্রেন ধরতে হবে।

(vii) কোন বাক্যে পরীক্ষা অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. কষ্টি পাথরে সোনা কষে নাও
গ. এখন ভাবতে থাক
খ. আমাকে করতে দাও
ঘ. আমরা পরীক্ষা দিয়ে আসছি।

(viii) কোন বাক্যে নির্দেশ অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তিনি হয়তো বসে থাকবেন
গ. অনেক কাজ করেছ, এখন বসে থাক
খ. কাজ করে সে বসে থাকবে
ঘ. তুমি কি এখন বসে থাকবে?

(ix) কোন বাক্যে ইয়া (>এ) বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাচ্ছে?

ক. কথা কয়ে দেখ
গ. রাজশাহী গিয়ে ফিরে আসব
খ. গান গেয়ে গেয়ে পথ চলেছে
ঘ. এখন গিয়ে কী করবে?

(x) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া নিমিত্ত অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দেখতে দেখতে সে এসে গেল
গ. পরীক্ষা দিতে ঢাকা যাব
খ. মেয়েটি গাইতে জানে
ঘ. সে খেতে ভালোবাসে।

২। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। এক কর্তা, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ দাও। নিরপেক্ষ কর্তা কাকে বলে?

৪। অসমাপিকা ক্রিয়াতে কী কী বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত থাকে? স্বরচিত বাক্যে এদের প্রয়োগ দেখাও।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে কী কী অর্থে ‘ইলে’ বা ‘লে’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে বুঝিয়ে লেখ।

ক. ছুটি হলে দেশে যাব।
খ. বৃষ্টি হলে ভালো ফসল হয়।
গ. ‘জন্মিলে মরিতে হবে।’
ঘ. তার কথা শুনলে হাসি পায়।
ঙ. চাচা গেলেও যে কাজ হবে, আমি গেলেও সেই কাজ হবে।

৬। উদাহরণ দাও।

ক. ক্রিয়া সংঘটনের অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ------‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।
খ. হেতু অর্থে----‘ইয়া’ বা ‘এ’ বিভক্তি।
গ. অনুসর্গ রূপে----‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।

৭। নিম্নলিখিত অর্থে 'ইয়া' বা 'এ' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখাও–

ক. বিধি বোঝাতে।

খ. ক্রিয়ার নিরন্তরতা প্রকাশে।

গ. শেখা অর্থে।

ঘ. ক্রিয়ার বিশেষ্য গঠনে।

ঙ. সমকালতা বোঝাতে।

চ. উপক্রম অর্থে।

ছ. আবশ্যকতা অর্থে।

৮। যৌগিক ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? যৌগিক ক্রিয়ার গঠনবিধি সংক্ষেপে লেখ।

৯। নিম্নলিখিত বাক্যের মধ্যে মোটা হরফে লিখিত পদসমূহে কোন কোন অর্থে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে?

ক) সাইরেন **বেজে উঠল**।

খ) সন্ধ্যা **ঘনিয়ে এল**।

গ) নির্যাতিতরাই একদিন মাথা **উঁচিয়ে উঠবে**।

ঘ) **নেয়ে খেয়ে এস**।

ঙ) হঠাৎ ঘুম **ভেঙে যায়**।

চ) এ কাকে **ডেকে এনেছিস**?

ছ) তারপরই নিরুদ্দেশ **হয়ে যাই** দীর্ঘ দিনের জন্য।

১০। অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে শূন্যস্থান পূরণ কর–

ক) কাঁদিতে–––––জীবন গেল।

খ) বড় যদি–––––চাও, ছোট হও তবে।

গ) খোকাকে–––––দেখলে–––––দিও।

ঘ) নাসিমা কি গান–––––জানত?

ঙ) আজ বৃষ্টি––––পারে।

চ) –––––ডেকে দিও।

ছ) '–––––করিও কাজ–––––ভাবিও না।'

জ) 'সুখের–––––এ ঘর বাঁধিনু অনলে––––গেল।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলা অনুজ্ঞা

ক. কাল একবার **এসো**।

খ. তুই বাড়ি **যা**।

গ. '**ক্ষমা কর** মোর অপরাধ।'

ওপরের বাক্যগুলোর প্রথম বাক্যে অনুরোধ, দ্বিতীয় বাক্যে আদেশ এবং তৃতীয় বাক্যে প্রার্থনা বোঝাচ্ছে।

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যেরূপ হয় তাকে **অনুজ্ঞা পদ** বলে।

অনুজ্ঞা পদের গঠন

১. মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধাতুটিই ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক তুই (বই) পড়্। তোরা (বই) পড়্।

কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুরূপ অর্থে সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'আপনি' বা 'আপনারা' এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'তুমি' বা 'তোমরা' পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন–

সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ– আপনি (আপনারা) আসুন (আস্+উন)।

সাধারণ মধ্যম পুরুষ– তুমি (তোমরা) আস (আস্ + অ)।

২. প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল। এই 'হ' বর্তমানে অ এবং ও তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন–

ক. 'করহ [=কর] আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় লাজ।'
খ. 'অধম সন্তানের মাগো দেহ [দাও] পদচ্ছায়া।'

৩. ক. উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।
খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

৪. ক. মধ্যম ও নাম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ ঃ

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	উদাহরণ/ক্রিয়াপদ
১. সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	উন, ন	যাউন, যান
২. সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	কর, করো, যাও
৩. তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর্, যা
৪. সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

জ্ঞাতব্য : ক. নির্দেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি = এন। যেমন– আপনি দেখেন।

সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি– 'উন'। যেমন–আপনারা দেখুন।

খ. চলতি ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ–কারান্ত বা ও–কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন– নেন, লন, নিন < লউন, লোন।

গ. মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি		ক্রিয়াপদ	
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা,	–ইবেন	–বেন	করিবেন	করবেন
	তিনি, তাঁরা				
সাধারণ	তুমি, তোমরা	–ইও	–ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	–ইস	–স	করিস, খাইস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	–ইবে	–বে	করিবে	করবে

দ্রষ্টব্য : ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে –ইতে/–তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করা যায়। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এবং থাক্ ধাতুর সঙ্গে (সাধারণ) বর্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি যুক্ত করে যে ক্রিয়াপদ হয়, উভয়ে মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

(সে)–ইতে/–তে + –উক (করিতে/করতে থাকুক)।

(তিনি/আপনি) –ইতে/–তে + উন (করিতে/করতে থাকুন)

(তুমি)–ইতে/–তে + –অ–ও (করিতে/করতে থাক/থাকো)।

(তুই)–ইতে/তে + – ০ (করিতে/করতে থাক্)

মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি–ইতে/–তে যুক্ত হয়; এরূপ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সাধারণ বর্তমানের অনুজ্ঞার ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত থাক্ ধাতু (ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার) মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে।

থাক্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলোই অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশ করে। মূল ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি ঘটমানতা প্রকাশে সাহায্য করে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : উপর্যুক্ত কারণেই ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার জন্য পৃথক ক্রিয়াবিভক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। যেমন–

–ইতে/–তে+ – ইবেন/– বেন (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

–ইতে/ –তে + ইও – এ/–ও (করিতে থাকিও/করতে থেকো)।

–ইতে/ – তে + –ইস (করিতে থাকিস/করতে থাকিস)।

–ইতে/ –তে+ – ইবে/–বে (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

জ্ঞাতব্য

ক) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।

খ) সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপটি সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।

ক. বর্তমান কাল

(১) আদেশ : কাজটি করে **ফেল**। তোমরা এখন **যাও**।

(২) উপদেশ : সত্য গোপন **করো না**।
কড়া রোদে ঘোরাফেরা **করিস না**।
'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।'

(৩) অনুরোধ : আমার কাজটা এখন **কর**।
অঙ্কটা বুঝিয়ে **দাও না**।

(৪) প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা **পড়ুন**।

(৫) অভিশাপ : **মর**, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

(১) আদেশে : সদা সত্য **বলবে**।

(২) সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে **পারবে**।

(৩) বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ **খাবে**।

(৪) অনুরোধে : কাল একবার **এসো** (বা আসিও বা আসিবে)।

অনুশীলনী

১। প্রতি প্রশ্নের চারটি উত্তরের ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(i) কোন ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে?

ক. রোগ হলে ওষুধ খেতে হবে
খ. সদা সত্য বলবে
গ. চেষ্টা কর, বুঝতে পারবে
ঘ. কাল এসো।

(ii) তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভক্তি কোনটি?

ক. –ইস
খ. –স
গ. –ও
ঘ. –ইও

(iii) সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভক্তি কোনটি?

ক. –উন
খ. –ন
গ. –ও
ঘ. শূন্য

(iv) 'ওখানে যাস না।' – কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ　　গ. অনুরোধ

খ. উপদেশ　　ঘ. বিধান

(v) 'খোদা আপনার মঙ্গল করুন।' – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ　　গ. উপদেশ

খ. প্রার্থনা　　ঘ. অনুরোধ।

(vi) 'ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো।'– কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. আদেশ　　গ. অনুরোধ

খ. উপদেশ　　ঘ. বিধান।

(vii) 'তোর সর্বনাশ হোক।' – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. প্রার্থনা　　গ. অভিশাপ

খ. উপদেশ　　ঘ. আদেশ।

(viii) 'আমাকে সাহায্য করুন।' – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?

ক. অনুরোধ　　গ. আদেশ

খ. প্রার্থনা　　ঘ. উপদেশ।

২। অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝ? কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়?

৩। বর্তমান কালের অনুজ্ঞার বিভক্তিসমূহ লেখ।

৪। 'ভবিষ্যৎ অর্থে অনুজ্ঞা পদ মধ্যম পুরুষেই সীমাবদ্ধ।'–এ উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।

৫। বাক্য গঠন কর

ক. অনুরোধ বর্তমান অনুজ্ঞা

খ. সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

গ. অভিশাপে বর্তমান অনুজ্ঞা

ঘ. উপদেশে বর্তমান অনুজ্ঞা।

৬। কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে, নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর পাশে লেখ।

ক) 'ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'

খ) 'তবে যদি দয়া কর, ক্ষমা করো মোর অপরাধ।'

গ) 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।'

ঘ) খোদা তোমার হায়াত দরাজ করুন।

ঙ) সে জাহান্নামে যাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্রিয়া–বিভক্তি : সাধু ও চলিত

আমি **যাই**।

আপনারা **যাবেন**।

সে **যাচ্ছে**।

তাঁরা **যাচ্ছিলেন**।

ওপরে যা–ধাতুর সঙ্গে ‘ই’, ‘বেন’, ‘চ্ছে’ ও চ্ছিলেন’ বিভক্তি যুক্ত করে সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলো গঠিত হয়েছে।

ধাতুর উত্তর যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে, ঐ সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলা হয়।

১. বিভক্তিসমূহ ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বাচ্যভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন–

আমি যাই–সাধারণ বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ।

আপনারা যাবেন–সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে (সম্ভ্রমাত্মক) মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ।

২. সাধু ও চলিত রীতিভেদেও ক্রিয়াবিভক্তির পরিবর্তন হয়। যথা–

সাধু	চলিত
আপনি ভাত খাইয়াছেন।	আপনি ভাত খেয়েছেন।
তাহারা বাড়ি যাইতেছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়াতেও ক্রিয়াবিভক্তির অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–

সাধু রীতি (প্রযোজক)	চলিত রীতি (প্রযোজক)
আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়াছি।	আমি তাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছি।
রত্না মণিকে গান শিখাইতেছিল।	রত্না মণিকে গান শেখাচ্ছিল।

ধাতুর গণ : ‘গণ’ শব্দের অর্থ শ্রেণি। কিন্তু ধাতুর ‘গণ’ বলতে ধাতুগুলোর বানানের ধরন বোঝায়। ‘ধাতুর গণ’ ঠিক করতে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন–

(ক) ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত?

(খ) ধাতুর প্রথম বর্ণে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

‘হওয়া’ ক্রিয়ার ধাতু ০ হ (হ্ + অ)। ‘হ’ একাক্ষর ধাতু এবং প্রথম বর্ণ হ্–এর সাথে স্বরবর্ণ ‘অ’ যুক্ত আছে। সুতরাং হ–আদিগণের মধ্যে ল–ধাতু (ক্রিয়াপদ–লওয়া) পড়বে।

বাংলা ভাষার সমস্ত ধাতুকে বিশটি গণে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১। হ–আদিগণ : হ (হওয়া), ল (লওয়া) ইত্যাদি।
২। খা–আদিগণ : খা (খাওয়া), ধা (ধাওয়া), পা (পাওয়া), যা (যাওয়া) ইত্যাদি।
৩। দি–আদিগণ : দি (দেওয়া), নি (নেওয়া) ইত্যাদি।
৪। শু–আদিগণ : চু (চোঁয়ানো), নু (নোয়ানো), ছু (ছোঁয়া) ইত্যাদি।
৫। কর্–আদিগণ : কর্ (করা), কম্ (কমা), গড় (গড়া), চল্ (চলা) ইত্যাদি।
৬। কহ্–আদিগণ : কহ্ (কহা), সহ্ (সহা), বহ্ (বহা) ইত্যাদি।
৭। কাট্– আদিগণ : গাঁথ্, চাল্, আক্, বাঁধ্, কাঁদ্, ইত্যাদি।
৮। গাহ্–আদিগণ : চাহ্, বাহ্, নাহ্ (নাহান<স্নান) ইত্যাদি।
৯। লিখ্–আদিগণ : কিন্, ঘির্, জিত্, ফির্, ভিড়্, চিন্ ইত্যাদি।
১০। উঠ্ আদিগণ : উড়্, শুন্, ফুট্, খুঁজ্, খুল্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি।
১১। লাফা–আদিগণ : কাটা, ডাকা, বাজা, আগা (অগ্রসর হওয়া) ইত্যাদি।
১২। নাহা–আদিগণ : গাহা ইত্যাদি।
১৩। ফিরা–আদিগণ : ছিটা, শিখা, ঝিমা, চিরা ইত্যাদি।
১৪। ঘুরা– আদিগণ : উঁচা, লুকা, কুড়া (কুড়াচ্ছে) ইত্যাদি।
১৫। ধোয়া–আদিগণ : শোয়া, খোঁচা, খোয়া, গোছা, যোগা ইত্যাদি।
১৬। দৌড়া–আদিগণ : পৌঁছা, দৌড়া ইত্যাদি।
১৭। চট্‌কা–আদিগণ : সম্‌ঝা, ধম্‌কা, কচ্‌লা ইত্যাদি।
১৮। বিগ্‌ড়া–আদিগণ : হিঁচ্‌ড়া, ছিট্‌কা, সিট্‌কা ইত্যাদি।
১৯। উল্‌টা– আদিগণ : দুম্‌ড়া, মুচ্‌ড়া, উপ্‌চা ইত্যাদি।
২০। ছোবলা – আদিগণ : কোঁচকা, কোঁকড়া, কোদলা ইত্যাদি।

ধাতু–বিভক্তির রূপ

বর্তমান কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে				তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১. সাধারণ	–এ	–এ	–এন	–এন	–অ	–অ	–ইস্	–ইস্	–ই	–ই
২. ঘটমান	–ইতেছে	–ছে –চ্ছে	–ইতেছেন	–ছেন –চ্ছেন	–ইতেছ	–ছ –চ্ছ	–ইতেছিস্	–ছিস্ –চ্ছিস্	–ইতেছি	–ছি –চ্ছি
৩. পুরাঘটিত	–ইয়াছে	–এছে	–ইয়াছেন	–এছেন	–ইয়াছ	–এছ	–ইয়াছিস্	–এছিস্	–ইয়াছি	–এছি
৪. অনুজ্ঞা	–উক	–উক	–উন	–উন	–অ –ও	–অ	–মূলধাতু	–মূলধাতু		

মন্তব্য : –ইতেছ, –ছ, –ইয়াছ, –এছ, বিভক্তিগুলোর চিহ্ন অ–কারান্ত।

অতীত কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম পুরুষ (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
৫। সাধারণ	–ইল	–ল	–ইলেন	–লেন	–ইলে	–লে	–ইলি	–লি	–ইলাম	–লাম –লুম
৬। নিত্যবৃত্ত	–ইত	–তে –তো	–ইতেন	–তেন	–ইতে	–তে	–ইতিস্	–তিস্	–ইতাম	–তাম –তুম
৭। ঘটমান	–ইতেছিল	–ছিল	–ইতেছিলেন	–ছিলেন	–ইতেছিলে	–ছিলে –চ্ছিলে	–ইতেছিলি	–ছিলি –চ্ছিলি	–ইতেছিলাম	–ছিলাম
৮। পুরাঘটিত	ইয়াছিল	–এছিল	–ইয়াছিলেন	–এছিলেন	–ইয়াছিলে	–এছিলে	–ইয়াছিলি	–এছিলি	–ইয়াছিলাম –ইয়াছি	–এছিলুম –এছিলাম

দ্রষ্টব্য : পরে, 'চ্ছ' থাকলে কর্ ধাতুর 'র' লোপ পায়। (কচ্ছিলে, কচ্ছিলি)।

ভবিষ্যৎ কাল

কাল	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
৯। সাধারণ	–ইবে	–বে	–ইবেন	–বেন	–ইবে	–বে	–ইবি	–বি	–ইব	–ব –বো
১০। অনুজ্ঞা	–ইবে	–বে	–ইবেন	–বেন	–ইও	–ও	–ইস	–ইস		

দ্রষ্টব্য : –ইল, –ল, –ইত, –ইতেছিল, –ছিল, –এছিল বিভক্তিগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

কর্ ধাতুর রূপ (সর্, গড়্, চল্ প্রভৃতি কর–আদিগণ)

কাল	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১। সাধারণ বর্তমান	করে	করে	করেন	করেন	কর	কর	করিস	করিস	করি	করি
২। ঘটমান বর্তমান	করিতেছে	করছে	করিতেছেন	করছেন	করিতেছ	করছ	করিতেছিস	করছিস	করিতেছি	করছি
৩। পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছে	করেছে	করিয়াছেন	করেছেন	করিয়াছ	করেছ	করিয়াছিস	করেছিস	করিয়াছি	করেছি
৪। বর্তমান অনুজ্ঞা/ আকাঙ্ক্ষা	করুক	করুক	করুন	করুন	কর	কর	কর্	কর্	০	০
৫। সাধারণ অতীত	করিল	করল	করিলেন	করলেন	করিলে	করলে	করিলি	করলি	করিলাম	করলাম
৬। নিত্যবৃত্ত অতীত	করিত	করত	করিতেন	করতেন	করিতে	করতে	করিতিস	করতিস	করিতাম	করতাম
৭। ঘটমান অতীত	করিতেছিল	করছিল	করিতেছিলেন	করছিলেন	করিতেছিলে	করছিলে	করিতেছিলি	করছিলি	করিতেছিলাম	করছিলাম
৮। পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিল	করেছিল	করিয়াছিলেন	করেছিলেন	করিয়াছিলে	করেছিলে	করিয়াছিলি	করেছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
৯। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিবে	করবে	করিবি	করবি	করিব	করব
১০। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিও	করো	করিস	করিস	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিনটি কালের দশটি ক্রমিক রূপের জন্য আমরা ধাতুরূপ সাধনে এরপর কালের পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ক্রমিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করব।

কর, করিতেছ, করছ, করিয়াছ, করেছ – শব্দগুলো শেষ ধ্বনির উচ্চারণ অ–কারান্ত।

যা–ধাতুর রূপ

(আদিবর্ণ আ–কার যুক্ত–খা, যা, পা, ধা প্রভৃতি খা–আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। যায়। যান। যাও। যাইস। যাই।	১। যায়। যান। যাও। যাস। যাই।
২। যাইতেছে। যাইতেছেন। যাইতেছ। যাইতেছিস। যাইতেছি।	২। যাচ্ছে। যাচ্ছেন। যাচ্ছ। যাচ্ছিস। যাচ্ছি।
৩। গিয়াছে। গিয়াছেন। গিয়াছ। গিয়াছিস। গিয়াছি।	৩। গেছে (গিয়েছে)। গিয়েছেন। (গেছেন) গিয়েছ (গেছ)। গিয়েছিস (গেছিস)। গিয়েছি (গেছি)।
৪। যাউক (যাক)। যান। যাও। যা।	৪। যাক। যান। যাও। যা।
৫। গেল (যাইল)। গেলেন (যাইলেন)। গেলে (যাইলে)। গেলি (যাইলি)। গেলাম (যাইলাম)	৫। গেল। গেলেন। গেলে। গেলি। গেলাম।
৬। যাইত। যাইতেন। যাইতে। যাইতিস্। যাইতাম।	৬। যেত। যেতেন। যেতে। যেতিস। যেতাম।
৭। যাইতেছিল। যাইতেছিলেন। যাইতেছিলে। যাইতেছিলি। যাইতেছিলাম।	৭। যাচ্ছিল। যাচ্ছিলেন। যাচ্ছিলে। যাচ্ছিলি। যাচ্ছিলাম।
৮। গিয়াছিল। গিয়াছিলেন। গিয়াছিলে। গিয়াছিলি। গিয়াছিলাম।	৮। গিয়েছিল। গিয়েছিলেন। গিয়েছিলে। গিয়েছিলি। গিয়েছিলাম।
৯। যাইবে। যাইবেন। যাইবে। যাইবি। যাইব।	৯। যাবে। যাবেন। যাবে। যাবি।যাব।
১০। যাইবে। যাইবেন। যাইও। যাইস।	১০। যাবে। যাবেন। যেও (যেয়ো)। যাস।

দ্রষ্টব্য : গিয়াছ, গেল, গিয়াছিল, যাইব, যাচ্ছ, গিয়েছ, গেছ, যেত, যাচ্ছিল, গিয়েছিল, যাব–শব্দগুলোর উচ্চারণ অ–কারান্ত।

লিখ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই–কার যুক্ত–কিন্ন ঘির, জিত্ ফির, ভিড়, চিন প্রভৃতি লিখ্–আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। লিখে। লিখেন। লিখ। লিখিস। লিখি।	১। লেখে। লেখেন। লেখ। লিখিস। লিখি।
২। লিখিতেছে। লিখিতেছেন। লিখিতেছ। লিখিতেছিস। লিখিতেছি।	২। লিখছে। লিখছেন। লিখছ। লিখছিস। লিখছি।
৩। লিখিয়াছে। লিখিয়াছেন। লিখিয়াছ। লিখিয়াছিস। লিখিয়াছি।	৩। লিখেছে। লিখেছেন। লিখেছ। লিখেছিস। লিখেছি।
৪। লিখুক। লিখুন। লিখ। লিখ্।	৪। লিখুক। লিখুন। লেখ। লেখ্।
৫। লিখিল। লিখিলেন। লিখিলে। লিখিলি। লিখিলাম।	৫। লিখল।লিখলেন। লিখলে। লিখলি। লিখলাম।
৬। লিখিত। লিখিতেন। লিখিতে। লিখিতিস। লিখিতাম।	৬। লিখত। লিখতেন। লিখতে। লিখতিস। লিখতাম।
৭। লিখিতেছিল। লিখিতেছিলেন। লিখিতেছিলে। লিখিতেছিলি। লিখিতেছিলাম।	৭। লিখছিল। লিখছিলেন। লিখছিলে। লিখছিলি। লিখছিলাম।
৮। লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলে। লিখিয়াছিলি। লিখিয়াছিলাম।	৮। লিখেছিল। লিখেছিলাম। লিখেছিলে। লিখেছিলি। লিখেছিলাম।
৯। লিখিবে। লিখিবেন। লিখিবে। লিখিবি। লিখিব।	৯। লিখবে। লিখবেন। লিখবে। লিখবি। লিখব।
১০। লিখিবে। লিখিবেন। লিখিও (লিখিয়ো)। লিখিস।	১০। লিখবে। লিখবেন। লিখো। লিখিস।

দ্রষ্টব্য : লিখ, লেখ, লিখিয়াছ, লিখেছ, লিখছ, লিখিত, লিখল, লিখিতেছিল, লিখছিল, লিখিত, লিখত— শব্দগুলোর উচ্চারণ অ–কারান্ত।

দে (দি) ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই–কার যুক্ত – 'নি' ইত্যাদি দি–আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। দেয়। দেন। দাও। দিস। দেই।	১। দেয়। দেন। দাও। দিস। দি (দিই)।
২। দিতেছে। দিতেছেন। দিতেছ। দিতেছিস। দিতেছি।	২। দিচ্ছে। দিচ্ছেন। দিচ্ছ। দিচ্ছিস। দিচ্ছি।
৩। দিয়াছে। দিয়াছেন। দিয়াছ। দিয়াছিস। দিয়াছি।	৩। দিয়েছে। দিয়েছেন। দিয়েছ। দিয়েছিস। দিয়েছি।
৪। দিক। দিন। দাও। দে।	৪। সাধু রীতির মতো
৫। দিল (দিলো)। দিলেন। দিলে। দিলি। দিলাম।	৫। সাধু রীতির মতো
৬। দিত। দিতেন। দিতে। দিতি। দিতাম।	৬। সাধু রীতির মতো।
৭। দিতেছিল। দিতেছিলেন। দিতেছিলে। দিতেছিলি। দিতেছিলাম।	৭। দিচ্ছিল। দিচ্ছিলেন। দিচ্ছিলে। দিচ্ছিলি। দিচ্ছিলাম।
৮। দিয়াছিল। দিয়াছিলেন। দিয়াছিলে। দিয়াছিলি। দিয়াছিলাম।	৮। দিয়েছিল। দিয়েছিলেন। দিয়েছিলে। দিয়েছিলি। দিয়েছিলাম।
৯। দিবে। দিবেন। দিবি। দিব।	৯। দেবে। দেবেন। দিবি। দেব।
১০। দিবে। দিবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।	১০। দেবে। দেবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।

উঠ্ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ উ–কার যুক্ত – উড়, শুন্, পুট্, খুঁজ্, খুল্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি উঠ্–আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। উঠে। উঠেন। উঠ। উঠিস। উঠি।	১। ওঠে। ওঠেন। ওঠ। উঠিস। উঠি।
২। উঠিতেছে। উঠিতেছেন। উঠিতেছ। উঠিতেছিস। উঠিতেছি।	২। উঠছে। উঠছেন। উঠছ। উঠছিস। উঠছি।
৩। উঠিয়াছে। উঠিয়াছেন। উঠিয়াছ। উঠিয়াছিস। উঠিয়াছি।	৩। উঠেছে। উঠেছেন। উঠেছ। উঠেছিস। উঠেছি।
৪। উঠুক। উঠুন।উঠ। উঠ্ ।	৪। উঠুক। উঠুন। ওঠ। ওঠ্ ।
৫। উঠিল। উঠিলেন। উঠিলে। উঠিলি। উঠিলাম।	৫। উঠল। উঠলেন। উঠলে। উঠলি। উঠলাম।
৬। উঠিত। উঠিতেন। উঠিতে। উঠিতিস। উঠিতাম।	৬। উঠত। উঠতেন। উঠতে। উঠতিস। উঠতাম।
৭। উঠিতেছিল। উঠিতেছিলেন। উঠিতেছিলে। উঠিতেছিলি। উঠিতেছিলাম।	৭। উঠছিল। উঠছিলেন। উঠছিলে। উঠছিলি। উঠছিলাম।
৮। উঠিয়াছিল। উঠিয়াছিলেন। উঠিয়াছিলে। উঠিয়াছিলি। উঠিয়াছিলাম।	৮। উঠেছিল। উঠেছিলেন। উঠেছিলে। উঠেছিলি। উঠেছিলাম।
৯। উঠিবে। উঠিবেন। উঠিবে। উঠিবি। উঠিব।	৯। উঠবে। উঠবেন। উঠবে। উঠবি। উঠব।
১০। উঠিবে। উঠিবেন। উঠিও (উঠিয়ো)। উঠিস্।	১০। উঠবে। উঠবেন। উঠো। উঠিস।

দ্রষ্টব্য : উঠ, ওঠ, উঠছ, উঠিল, উঠিতেছিল, উঠছিল, উঠিয়াছিল–শব্দগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

শু–ধাতু (আদ্যবর্ণ উ–কার যুক্ত–চুঁ, নু, ছুঁ ইত্যাদি শু–আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই।	১। শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই।
২। শুইতেছে। শুইতেছেন। শুইতেছ। শুইতেছিস। শুইতেছি।	২। শুচ্ছে। শুচ্ছেন। শুচ্ছ। শুচ্ছিস। শুচ্ছি।
৩। শুইয়াছে। শুইয়াছেন। শুইয়াছ। শুইয়াছিস। শুইয়াছি।	৩। শুয়েছে। শুয়েছেন। শুয়েছ। শুয়েছিস। শুয়েছি।
৪। শুক। শোন। শোও। শো।	৪। সাধু রীতির মতো।
৫। শুইল। শুইলেন। শুইলে। শুইলি। শুইলাম।	৫। শুল। শুলেন। শুলে। শুলি। শুলাম।
৬। শুইত। শুইতেন। শুইতে। শুইতিস। শুইতাম।	৬। শুম। শুতেন। শুতে। শুতিস। শুতাম।
৭। শুইতেছিল। শুইতেছিলেন। শুইতেছিলে। শুইতেছিলি। শুইতেছিলাম।	৭। শুচ্ছিল। শুচ্ছিলেন। শুচ্ছিলে। শুচ্ছিলি। শুচ্ছিলাম।
৮। শুইয়াছিল। শুইয়াছিলেন। শুইয়াছিলে। শুইয়াছিলি। শুইয়াছিলাম।	৮। শুয়েছিল। শুয়েছিলেন।। শুয়েছিলে। শুয়েছিলি। শুয়েছিলাম।
৯। শুইবে। শুইবেন। শুইবে। শুইবি। শুইব।	৯। শোবে। শোবেন। শোবে। শুবি। শোবো।
১০। শুইবে। শুইবেন। শুইও (শুইয়ো)। শুইবি।	১০। শোবে। শোবেন। শুয়ো। শুস।

দ্রষ্টব্য : শুইছ, শুইতেছ, শুইয়াছ, শুয়েছ, শুইল, শুল, শুইত, শুত, শুইতেছিল, শুচ্ছিল, শুইয়াছিল, শুয়েছিল, শুইত– শব্দগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

প্রযোজক ধাতুর রূপ

১। প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কখনো কখনো মূল ধাতুর সঙ্গে শুধু প্রযোজক রূপটি যুক্ত হয়। যেমন– শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়াইয়াছেন। – সাধু রূপ।

[√ পড় + আ= পড়া (প্রযোজক ধাতু) + ইয়াছেন (বিভক্তি)।

শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়িয়েছেন – চলিত রূপ।

[√পড় + ০ (অর্থাৎ প্রযোজক–প্রকরণের আ যুক্ত হলো না) + ইয়েছেন = পড়িয়েছেন– চলিত রূপ।] চলিত রূপে আরও কয়েকটি ধাতুর পরিবর্তন লক্ষণীয়–

হ–ধাতু : দাঁড়াও, তোমাকে **হওয়াচ্ছি**।

শিখ্–ধাতু : কে তোমাকে গান **শেখাচ্ছে?**

শুন্–ধাতু : এ কী কথা **শোনালি** রে!

প্রযোজক ধাতুর বিভক্তি

বর্তমান কাল

কাল বিভাগ	সে		তিনি আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১। সাধারণ	*য়	*য়	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স	*ই	*ই
২। ঘটমান	*ইতেছে	*চ্ছে	*ইতেছেন	* চ্ছেন	*ইতেছ	* চ্ছ	*ইতেছিস	* চ্ছিস	*ইতেছি	*চ্ছি
৩। পুরাঘটিত	*ইয়াছে	*ইয়েছে	*ইয়াছেন	* ইয়েছেন।	*ইয়াছ	* ইয়েছ	*ইয়াছিস	*ইয়েছিস	*ইয়াছি	*ইয়েছি।
৪। অনুজ্ঞা	*উক	*ক	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স		

অতীত কাল

৫। সাধারণ	*ইল	*ল * লো	*ইলেন	*লেন	*ইলে	*লে	*ইলি	*লি	*ইলাম	*লাম
৬। নিত্যবৃত্ত	*ইত	*ত *তো	*ইতেন	*তেন	*ইতে	*তে	*ইতিস	*তিস	*ইতাম	*তাম
৭। ঘটমান	*ইতেছিল	*চ্ছিল	*ইতেছিলেন	*চ্ছিলেন	*ইতেছিলে	*চ্ছিলে	*ইতিছিলি	*চ্ছিলি	*ইতেছিলাম	*চ্ছিলাম
৮। পুরাঘটিত	*ইয়াছিল	০ ইয়েছিল	*ইয়াছিলেন	০ ইয়েছিলেন	*ইয়াছিলে	০ ইয়েছিলে	*ইয়াছিলি	০ ইয়েছিলি	*ইয়াছিলাম	০ ইয়েছিলাম

ভবিষ্যৎ কাল

৯। সাধারণ	*ইবে	*বে	*ইবেন	*বেন	*ইবে	*বে	*ইবি	*বি	*ইব*ব	*বো
১০। অনুজ্ঞা	*উক	*ক	*বেন	*বেন	*ইও	*য়ো	*ইস্	*স		

জ্ঞাতব্য : ধাতুর প্রযোজক রূপ সাধনে তারকা চিহ্নের (*) স্থলে মূল ধাতুর পরে (আ–কার) সংযোজিত হবে, কিন্তু ০ স্থলে হবে না।

‘কর’ ধাতুর প্রযোজক রূপ

কাল	সে		তিনি আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
১। সাধারণ বর্তমান	করায়	করায়	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
২। ঘটমান বর্তমান	করাইতেছে	করাচ্ছে	করাইতেছেন	করাচ্ছেন	করাইতেছ	করাচ্ছ	করাইতেছিস	করাচ্ছিস	করাইতেছি	করাচ্ছি
৩। পুরাঘটিত বর্তমান	করাইয়াছে	করায়েছে করিয়েছে	করাইয়াছেন	করিয়েছেন	করাইয়াছ	করিয়েছ	করাইয়াছিস	করিয়েছিস	করাইয়াছি	করিয়েছি
৪। অনুজ্ঞা/আকাঙ্ক্ষা বর্তমান	করাক	করাক	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
৫। সাধারণ অতীত	করাইল	করাল	করাইলেন	করালেন	করাইলে	করালে	করাইলি	করালি	করাইলাম	করালাম
৬। নিত্যবৃত্ত অতীত	করাইত	করাত	করাইতেন	করাতেন	করাইতে	করাতে	করাইতিস	করাতিস	করাইতাম	করাতাম
৭। ঘটমান অতীত	করাইতেছিল	করাচ্ছিল	করাইতেছিলেন	করাচ্ছিলেন	করাইতেছিলে	করাচ্ছিলে	করাইতেছিলি	করাচ্ছিলি	করাইতেছিলাম	করাচ্ছিলাম
৮। পুরাঘটিত অতীত	করাইয়াছিল	করিয়েছিল	করাইয়াছিলেন	করিয়েছিলেন	করাইয়াছিলে	করিয়েছিলে	করাইয়াছিলি	করিয়েছিলি	করাইয়াছিলাম	করিয়েছিলাম
৯। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করাইবে	করাবে	করাইবেন	করাবেন	করাইবে	করাবে	করাইবি	করাবি	করাইব	করাব
১০। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করাক	করাক	করান	করান	করাইও	করায়ো	করাইস	করাস্		

পরিশিষ্ট : ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কতিপয় পরিবর্তন

১. মূলস্বর অ–কারান্ত

কহ্ ধাতু : কইতাম, কইলাম, কইতি, কইতিস, কয়েছিস ইত্যাদি।

২. মূলস্বর আ–কারান্ত

(ক) খা–ধাতু : খেলাম (খাইলাম), খেলেন (খাইলেন), খেল, খেলে, (খাইল), খেয়েছে ইত্যাদি।

(খ) যা–ধাতু : গেল (যাইল), গিয়েছিল, যেত–যেতো (যাইত), যেতেছিল, যাচ্ছিল (যাইতেছিল) ইত্যাদি।

(গ) গাহ্ (গৈ)–ধাতু : (চলিত রূপ)– গাইত, গাইলাম, গেয়েছি, গেয়েছিলাম, গেয়েছ, গাইলে, গাইতিস, গাইছিস, গাইবে, গাবে, গাইব, গাব ইত্যাদি।

৩. মূলস্বর ই বা ঈ–কারান্ত : শিখ্ ধাতু (চলিত রূপ)–শেখো, শেখেন, শেখে (শিখে), শিখিস, শিখলাম, শেখ ইত্যাদি।

৪। মূলস্বর উ–কারান্ত : শুন্ ধাতু– শোনো, শোনেন, শোনে, শুনলাম, শুনেছি, শুনতাম, শুনেছিস, শোনাও ইত্যাদি।

৫। মূলস্বর এ–কারান্ত : দে, (দি) ধাতু–দিই, দেয়, দেন, দিন, দাও, দিলাম, দিয়েছিলাম, দিতাম (দিতুম), দেব (দেবো), দিচ্ছে, দিচ্ছিলুম, দাও, দে, দিন, দিক, দিয়ো (দিবো) ইত্যাদি।

৬। মূলস্বর ও–কারান্ত : ধো–ধাতু–ধোয়, ধোন, ধোও, ধুচ্ছিস, ধুইবি, ধুয়েছিল, ধোস, ইত্যাদি। বাকি সবগুলো উ–কার যুক্ত ধাতুর রূপের ন্যায়।

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কয়েকটি পরিবর্তন

(বন্ধনীর মধ্যে সাধু রূপটিও দেখানো হলো)

(ক) **মূলস্বর অ–কারান্ত** : 'হ' – হইয়েছে (হওয়াইয়াছে), হইয়েছিস (হওয়াইয়াছিস), হইয়েছিলুম (হওয়াইয়াছিলাম), হওয়াচ্ছি (হওয়াইতেছি), হয়ায়ো (হওয়াইও)।

(খ) **মূলস্বর ই–ঈ–কারান্ত** : হলে প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ কখনো ই–কারান্ত এবং কখনো এ–কারান্ত হয়। যেমন – (সাধু) শিখ > (চলিত) শেখ (ধাতু)।

রূপ সাধন : শিখাই–শেখাই–শিখুই। শেখাও–শিখোও। শেখালুম,–শিখোলুম। শেখালে–শিখোলে। শেখাতুম–শিখোতুম। শেখাতিস–শিখেতিস। শেখাত–শিখোতো। শেখাবি–শিখোবি। শিখাচ্ছি–শিখেচ্ছি (শিখাচ্ছি)। শেখাচ্ছে–শিখুচ্ছে। শেখাচ্ছিল–শিখেচ্ছিল। শেখাও–শেখোও। শেখ–শিখো।

(গ) **মূলস্বর উ–কারান্ত** : এর দুটো রূপ দেখা যায়। বন্ধনীর মধ্যে দ্বিতীয় রূপটিও দেখানো হলো।

শুন–ধাতুর রূপ সাধন : শুনাই (শোনাই)। শোনাও (শুনোও)। শুনান (শুনোন)। শোনায় (শুনোয়)। শুনানি (শুনোনি)। শুনালুম (শুনোলুম)। শোনাতুম (শুনোতুম)। শোনাতিস (শুনেতিস–শুনোতিস–শুনুতিস)। শোনাব (শুনোব)। শোনাচ্ছ (শুনাচ্ছ)। শোনাও (শোনোও)। শোনাস (শুনোস) ইত্যাদি।

বাক্য গঠন : আহা! কী হওয়াটাই না তুমি **হওয়ালে**। দাঁড়াও তোমাকে **শেখাচ্ছি**। তুই আর আমাকে কী **শিখুবি**? রোজ তোমাকে কত রূপকথা **শোনাই**। 'কী কথা **শুনালি** মোরে'। ওকে তুমি কী **শুনাচ্ছ?**

কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণ সহকারী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন –

১. √আ–আইল>এল। আইলেন>এলেন। আইলে>এলে। আইলি>এলি। আইলাম>এলাম। আয় (অনুজ্ঞা)।

২. √আছ্ – (বর্তমান কালে) : আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি। (অতীত কালে) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।

৩। নহ্ ধাতু–(বর্তমান কালে) : নন, নহে, নহেন > নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।

৪। বট্ ধাতু – (বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।

৫। থাক্ (রহ্) ধাতু (বর্তমান কালে): থাকে, থাকেন, রহেন, থাক, (রও), থাকিস, (রস, রোস, রহিস), থাকি (রই), থাকে (রয়) ইত্যাদি।

অতীত কাল : রহিত (রইত), রহিতেন (রইতেন), রহিতাম (রইতাম–রইতুম) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : রহিবে, (রইবে, রবে), রহিবেন (রইবেন), রহিবি (রইবি), রহিব (রইবো), রহিস (রোস, রোসো)।

বাক্য গঠন : 'কোথাকার জাদুকর **এলি** এখানে।' '**আইল** রাক্ষসকুল প্রভঞ্জন বেগে।' কেমন **আছিস**? কোথায় **ছিলি**? সে ব্যক্তিটি তুমি **নও**। 'একা দেখি কুলবধূ, কে **বট** আপনি? 'আজি ঘরে একলাটি পারবো না **রইতে**।' **রোসো**, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। 'হেথা **নয়**, হেথা **নয়**, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।'

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উত্তর দেওয়া হয়েছে। ঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) বাংলা ভাষার ধাতুর রূপ কয়টি?

ক. ১৮টি খ. ২০টি
গ. ১৯টি ঘ. ২১টি

(খ) কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু উঠ্–আদি গণের অন্তর্ভুক্ত?

ক. শুন্ খুঁজ্, ডুব,, তুস্ খ. সহ্, কহ্, বস্, শুন্,
গ. লিখ্, কিন্, বাহ্, ডুব্ ঘ. কিহ্, ডুব্, লিখ্, শুন্

(গ) কর্–ধাতুর উত্তম পুরুষ পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ কোনটি?

ক. করতাম খ. করিয়াছিলাম
গ. করিতাম ঘ. করেছিলাম

(ঘ) যা–ধাতুর মধ্যম পুরুষ নিত্যবৃত্ত অতীতের চলিত ভাষার রূপ কোনটি?

ক. গিয়েছিলে খ. যেতে
গ. যাচ্ছিলি ঘ. যাইত

(ঙ) দে–ধাতুর প্রথম পুরুষ ঘটমান বর্তমানের চলিত রীতির রূপ কোনটি?

ক. দিতেছে খ. দিত
গ. দিচ্ছে ঘ. দিয়েছিল

(চ) কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু অসম্পূর্ণ ধাতু?

ক. √আ, √বট, √শিখ্ √যা খ. √আছ, √তা,√ শিখ, √যা
গ. √আ, √থাক্, √আছ, √বট্ ঘ. √থাক্, √বট, √আ, √শিখ্

(ছ) প্রযোজক যা–ধাতুর পুরাঘটিত অতীত কালের প্রথম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. গেল খ. গিয়াছিল
গ. যেত ঘ. গিয়েছিল

(ঝ) নহ্–ধাতুর সাধারণ বর্তমান উত্তম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. নহি খ. নহে

গ. নই ঘ. নয়

২। ধাতু কাকে বলে? ধাতু কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর দুটো করে উদাহরণ দাও।

৩। নামধাতু বলতে কী বোঝ? নামধাতু কীভাবে গঠিত হয়, বাক্যে এর ব্যবহার দেখাও।

৪। সংজ্ঞা লেখ এবং বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।
ণিজন্ত ধাতু, অসম্পূর্ণ ধাতু, সংযোগমূলক ধাতু

৫। নিম্নলিখিত ধাতুগুলোর সাধু ও চলিত রূপ লেখ।
বল্, শিখ্, দে, শুন্, যা, কহ্, পড়্, লিখ্।

৬। শুন্–ধাতুর ণিজন্ত–প্রকরণের রূপগুলো লেখ।

৭। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

(ক) তিনটি ঘটমান কালের গাহ্ ধাতু।

(খ) কর্–ধাতুর ভবিষ্যৎ ণিজন্ত রূপ।

(গ) গাহ্–ধাতুর বর্তমান কালের চলিত রূপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

কারক : 'কারক' শব্দটির অর্থ – যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।
বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

কারক ছয় প্রকার :

১. কর্তৃকারক	৪. সম্প্রদান কারক
২. কর্ম কারক	৫. অপাদান কারক
৩. করণ কারক	৬. অধিকরণ কারক

একটি বাক্যে ছয়টি কারকের উদাহরণ–
* বেগম সাহেবা প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।
এখানে

১.	বেগম সাহেবা	–	ক্রিয়ার	সঙ্গে	কর্তৃসম্বন্ধ
২.	চাল	–	"	"	কর্ম সম্বন্ধ
৩.	হাতে	–	"	"	করণ সম্বন্ধ
৪.	গরিবদের	–	"	"	সম্প্রদান সম্বন্ধ
৫.	ভাঁড়ার থেকে	–	"	"	অপাদান সম্বন্ধ
৬.	প্রতিদিন	–	"	"	অধিকরণ সম্বন্ধ

বিভক্তি : বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন – ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

বাক্যটিতে ছাদে (ছাদ + এ বিভক্তি), মা (মা + ০ বিভক্তি), শিশুকে (শিশু + কে বিভক্তি), চাঁদ (চাঁদ + ০ বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। বিভক্তিগুলো ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে মনে করা হয়।

বাংলা শব্দ–বিভক্তি

০ শূন্য বিভক্তি (অথবা অ–বিভক্তি), এ, (য়), তে (এ), কে, রে,) র, (এরা) – এ কয়টিই খাঁটি বাংলা শব্দ বিভক্তি। এ ছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কয়েকটি অব্যয় শব্দও কারক–সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন–দ্বারা, দিয়ে, হতে, থেকে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ–বিভক্তি সাত প্রকার : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

একবচন এবং বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	: ০, অ, এ, (য়), তে, এতে।	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ।
দ্বিতীয়া	: ০, অ, কে, রে (এরে), এ, য়, তে।	দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের।
তৃতীয়া	: ০, অ, এ, তে, দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক।	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিগ কর্তৃক, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়ে, * গুলো দিয়ে, গুলি কর্তৃক, * দের দিয়ে।
চতুর্থী	: দ্বিতীয়ার মতো।	দ্বিতীয়ার মতো।
পঞ্চমী	: এ (য়ে, য়), হইতে, *থেকে, *চেয়ে, *হতে।	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।
ষষ্ঠী	: র, এর।	*দিগের, দের, গুলির, গণের, গুলোর।
সপ্তমী	: এ, (য়), য়, তে, এতে।	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে।

তারকা চিহ্নিত বিভক্তিগুলো এবং বন্ধনীতে লিখিত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তি যোগের নিয়ম

(ক) অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে 'রা' যুক্ত হয় না; গুলি, গুলো যুক্ত হয় যেমন–পাথরগুলো, গরুগুলি।

(খ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর 'কে' বা 'রে' বিভক্তি হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যথা – **কলম** দাও।

(গ) স্বরান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির রূপ হয় – 'য়' বা 'য়ে'। 'এ' স্থানে 'তে' বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে।

যেমন – মা+এ =মায়ে, ঘোড়া + এ = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে।

(ঘ) অ–কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর প্রায়ই 'রা' স্থানে 'এরা' হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' স্থলে 'এর' যুক্ত হয়। যেমন – লোক + রা = লোকেরা। বিদ্বান (ব্যঞ্জনান্ত) + রা = বিদ্বানেরা। মানুষ +এর = মানুষের। লোক + এর =লোকের। কিন্তু অ–কারান্ত, আ–কারান্ত এবং এ–কারান্ত খাঁটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক বচনে সাধারণ 'র' যুক্ত হয়, 'এর' যুক্ত হয় না। যেমন – বড়র, মামার, ছেলের।

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা **ক্রিয়ার কর্তা** বা **কর্তৃকারক**।

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা–ই কর্তৃকারক। যেমন – খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা – কর্তৃকারক)। মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে? মেয়েরা – কর্তৃকারক)।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক. কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে :

১. **মুখ্য কর্তা** : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন – **ছেলেরা** ফুটবল খেলছে। মুষলধারে **বৃষ্টি** পড়ছে।

২. **প্রযোজক কর্তা** : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে **প্রযোজক কর্তা বলে**। যেমন – **শিক্ষক** ছাত্রদের ব্যাকরণ **পড়াচ্ছেন**।

৩. **প্রযোজ্য কর্তা** : মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে **প্রযোজ্য কর্তা** বলা হয়। ওপরের বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা।

তদ্রূপ – রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

৪. **ব্যতিহার কর্তা** : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের **ব্যতিহার কর্তা বলে** । যেমন –

বাঘে–মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

রাজায়–রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত ।

খ. বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন রকম হতে পারে। যেমন–

১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : **পুলিশ** দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : **আমার** যাওয়া হবে না।

৩. কর্ম–কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : **বাঁশি** বাজে। **কলমটা** লেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি : **হামিদ** বই পড়ে।

খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **বশিরকে** যেতে হবে।

গ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : **ফেরদৌসী** কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।

ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **আমার** যাওয়া হয়নি।

(ঙ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : **গাঁয়ে** মানে না, আপনি মোড়ল।
বাপে না জিজ্ঞাসে, **মায়ে** না সম্ভাষে।
পাগলে কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায়।
বাঘে–**মহিষে** খানা একঘাটে খাবে না।
য়–বিভক্তি : **ঘোড়ায়** গাড়ি টানে।
তে–বিভক্তি : **গরুতে** দুধ দেয়।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে **কর্মকারক** বলে।

কর্ম দুই প্রকার : মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম। যেমন–

বাবা **আমাকে** (গৌণ কর্ম) একটি **কলম** (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা **ফুল** তুলছে।

খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : **ছেলেটিকে** বিছানায় শোয়াও।

গ) সমধাতুজ কর্ম : খুব এক **ঘুম** ঘুমিয়েছি।

ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন–

দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা **দুগ্ধ** (বিধেয় কর্ম) বলি, **হলুদকে** (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি **হরিদ্রা** (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : **ডাক্তার** ডাক।
আমাকে একখানা **বই** দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম)
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, **নজরুল** পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।
(গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগে)

(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : **তাকে** বল।
রে বিভক্তি : **'আমারে** তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা'।

(গ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : **তোমার** দেখা পেলাম না।

(ঘ) সপ্তমীর এ বিভক্তি : 'জিজ্ঞাসিবে **জনে জনে**।' (বীপ্সায়)

করণ কারক

'করণ' শব্দটির অর্থ : যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়।

ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই **করণ কারক** বলা হয়।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'কীসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, তা–ই করণ কারক। যেমন –

নীরা **কলম** দিয়ে লেখে। (উপকরণ –কলম)

'জগতে কীর্তিমান হয় **সাধনায়**।' (উপায় – সাধনা)

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ছাত্ররা **বল** খেলে। (অকর্মক ক্রিয়া)
ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। (সকর্মক ক্রিয়া)

(খ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : **লাঙ্গল দ্বারা** জমি চাষ করা হয়।
দিয়া বিভক্তি : **মন দিয়া** কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

(গ) সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : **ফুলে ফুলে** ঘর ভরেছে।
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।

তে বিভক্তি : 'এত শঠতা, এত যে ব্যথা,
তবু যেন তা **মধুতে** মাখা।' – নজরুল।
লোকটা **জাতিতে** বৈষ্ণব।

য় বিভক্তি : **চেষ্টায়** সব হয়।
এ **সুতায়** কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) **সম্প্রদান কারক** বলে। বস্তু নয়– ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক।

(অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ, কর্মকারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়।)

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

(ক) চতুর্থী বা কে বিভক্তি : **ভিখারিকে** ভিক্ষা দাও। (স্বত্বত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে। যেমন – ধোপাকে কাপড় দাও।)

(খ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : **সৎপাত্রে** কন্যা দান কর। **সমিতিতে** চাঁদা দাও। **'অন্ধজনে** দেহ আলো'।

জ্ঞাতব্য : নিমিত্তার্থে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হলে সেখানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন–'বেলা যে পড়ে এল, **জলকে** চল।'

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই **অপাদান কারক বলে**। যেমন–

বিচ্যুত	:	**গাছ থেকে** পাতা পড়ে। **মেঘ থেকে** বৃষ্টি পড়ে।
গৃহীত	:	**সুক্তি থেকে** মুক্তো মেলে। **দুধ থেকে** দই হয়।
জাত	:	**জমি থেকে** ফসল পাই। **খেজুর রসে** গুড় হয়।
বিরত	:	**পাপে** বিরত হও।
দূরীভূত	:	**দেশ থেকে** পঙ্গপাল চলে গেছে।
রক্ষিত	:	**বিপদ থেকে** বাঁচাও।
আরম্ভ	:	**সোমবার থেকে** পরীক্ষা শুরু।
ভীত	:	**বাঘকে** ভয় পায় না কে?

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি	:	**বোঁটা–আলগা ফল** গাছে থাকে না।' 'মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে **পাঠশালা পলায়ন**।'
(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি	:	**বাবাকে** বড্ড ভয় পাই।
(গ) ষষ্ঠী বা এর বিভিক্ত	:	যেখানে **বাঘের** ভয় সেখানে সন্ধে হয়।
(ঘ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি	:	**বিপদে** মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা। **লোকমুখে** শুনেছি। **তিলে** তৈল হয়।
য় বিভক্তি	:	**টাকায়** টাকা হয়।

বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার

(ক) স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।

(খ) দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।

(গ) নিক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী অর্থাৎ 'এ' 'য়' 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা–

আধার (স্থান) : আমরা রোজ **স্কুলে** যাই। এ **বাড়িতে** কেউ নেই।

কাল (সময়) : **প্রভাতে** সূর্য ওঠে।

অধিকরণ তিন প্রকার : ১. কালাধিকরণ।

২. আধারাধিকরণ।

৩. ভাবাধিকরণ।

যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে **ভাবাধিকরণ** বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে **ভাবে সপ্তমী** বলা হয়। যেমন –

সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। **কান্নায়** শোক মন্দীভূত হয়।

আধারাধিকরণ তিন ভাগে বিভক্ত : ১. ঐকদেশিক, ২. অভিব্যাপক এবং ৩. বৈষয়িক।

১. ঐকদেশিক : বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ বলে। যেমন –

পুকুরে মাছ আছে। (পুকুরের যে কোনো একস্থানে)

বনে বাঘ আছে। (বনের যে কোনো এক অংশে)

আকাশে চাঁদ উঠেছে। (আকাশের কোনো এক অংশে)

সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন–

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)। '**দুয়ারে** দাঁড়ায়ে প্রার্থী,

ভিক্ষা দেহ তারে (দুয়ারের কাছে), রাজার **দুয়ারে** হাতি বাঁধা।

২. অভিব্যাপক : উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে **অভিব্যাপক আধারাধিকরণ বলে**। যেমন–

তিলে তৈল আছে। (তিলের সারা অংশব্যাপী)

নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে।)

৩. বৈষয়িক : বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধিকরণ হয়। যেমন : রাকিব **অঙ্কে** কাঁচা, কিন্তু **ব্যাকরণে** ভালো।

আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, **যুদ্ধে** অপরাজেয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

(ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি **ঢাকা** যাব। বাবা **বাড়ি** নেই।

(খ) তৃতীয়া বিভক্তি : **খিলিপান** (এর ভিতরে) **দিয়ে** ওষুধ খাবে।

(গ) পঞ্চমী বিভক্তি : **বাড়ি থেকে** নদী দেখা যায়।

(ঘ) সপ্তমী বা তে বিভক্তি : এ **বাড়িতে** কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্গের ব্যবহার

ঘরের **মধ্যে** কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

পরিশিষ্ট

১। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তি

(ক) কর্তৃকারকে – **রহিম** বাড়ি যায়।

(খ) কর্মকারকে – **ডাক্তার** ডাক।

(গ) করণে – ঘোড়াকে **চাবুক** মার।

(ঘ) অপাদানে – গাড়ি **স্টেশন** ছাড়ে।

(ঙ) অধিকরণে – **সারারাত** বৃষ্টি হয়েছে।

২. বিভিন্ন কারকে সপ্তমী বা এ বিভক্তি

(ক) কর্তৃকারকে – **লোকে** বলে। **পাগলে** কী না বলে।

(খ) কর্মকারকে – এ **অধীনে** দায়িত্বভার অর্পণ করুন।

(গ) করণে – এ **কলমে** ভালো লেখা হয়।

(ঘ) অপাদানে – 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি **রাঘবে**?'

(ঙ) অধিকরণে – এ **দেহে** প্রাণ নেই।

সম্বন্ধ পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে **সম্বন্ধ পদ** বলে। যেমন– **মতিনের ভাই** বাড়ি যাবে।

এখানে 'মতিনের' সঙ্গে 'ভাই'–এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা : আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ + এর = খালিদের (বই)।

(খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা–

আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ) । পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটনা)

কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।

কিন্তু 'কাল' শব্দের উত্তর শুধু 'এর' বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন–

(ক) অধিকরণ সম্বন্ধ	:	**রাজার** রাজ্য, **প্রজার** জমি।
(খ) জন্য–জনক সম্বন্ধ	:	**গাছের** ফল, **পুকুরের** মাছ।
(গ) কার্যকারণ সম্বন্ধ	:	**অগ্নির** উত্তাপ, **রোগের** কষ্ট।
(ঘ) উপাদান সম্বন্ধ	:	**রূপার** থালা, **সোনার** বাটি।
(ঙ) গুণ সম্বন্ধ	:	**মধুর** মিষ্টতা, **নিমের** তিক্ততা।
(চ) হেতু সম্বন্ধ	:	**ধনের** অহংকার, **রূপের** দেমাক।
(ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ	:	**রোজার** ছুটি, **শরতের** আকাশ।
(জ) ক্রম সম্বন্ধ	:	**পাঁচের** পৃষ্ঠা, **সাতের** ঘর।
(ঝ) অংশ সম্বন্ধ	:	**হাতির** দাঁত, **মাথার** চুল।
(ঞ) ব্যবসায় সম্বন্ধ	:	**পাটের** গুদাম, **আদার** ব্যাপারি।
(ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ	:	**একের** তিন, **সাতের** পাঁচ।
(ঠ) কৃতি সম্বন্ধ	:	**নজরুলের** 'অগ্নিবীণা' **মাইকেলের** 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
(ড) আধার–আধেয়	:	**বাটির** দুধ, **শিশির** ওষুধ।
(ঢ) অভেদ সম্বন্ধ	:	**জ্ঞানের** আলোক, **দুঃখের** দহন।

(ণ) উপমান–উপমেয় সম্বন্ধ	:	**ননীর** পুতুল, **লোহার** শরীর।		
(ত) বিশেষণ সম্বন্ধ	:	**সুখের** দিন, **যৌবনের** চাঞ্চল্য।		
(থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ	:	**সবার** সেরা, **সবার** ছোট।		
(দ) কারক সম্বন্ধ	:	(১) কর্তৃ সম্বন্ধ	–	**রাজার** হুকুম।
		(২) কর্ম সম্বন্ধ	–	**প্রভুর** সেবা, **সাধুর** দর্শন।
		(৩) কারক সম্বন্ধ	–	**চোখের** দেখা, **হাতের** লাঠি।
		(৪) অপাদান সম্বন্ধ	–	**বাঘের** ভয়, **বৃষ্টির** পানি।
		(৫) অধিকরণ সম্বন্ধ	–	**ক্ষেতের** ধান, **দেশের** লোক।

সম্বোধন পদ

'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান করে কিছু বলা হয়, তাকে **সম্বোধন পদ** বলে। যেমন– **ওহে মাঝি,** আমাকে পার করো। **সুমন,** এখানে এসো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন – 'ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।' 'ওরে, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' 'অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?'

২. অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।

৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্ময়সূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন – ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস্।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হয়েছে। সর্বোত্তম উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(১) কোন বাক্যে ব্যতিহার কর্তা রয়েছে?

ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন
গ. বাঘে–মহিষে খানা একঘাটে খাবে না
খ. রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
ঘ. তোমাকে পড়তে হবে

(২) কোন বাক্যটিতে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হয়েছে?

ক. শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন
খ. ডাক্তার ডাক
গ. তারা বল খেলে
ঘ. আমি ঢাকা যাচ্ছি

(৩) কোন বাক্যটিতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে?

ক. তেলাপোকাকে ভয় পাই
খ. তাকে ডেকে আন
গ. ভিক্ষুককে দান কর
ঘ. 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'

(৪) কোন বাক্যে ভাবে সপ্তমী-র প্রয়োগ রয়েছে?

ক. সূর্যাস্তে চারদিক অন্ধকারে আবৃত হয়
খ. লোকে কত কথা বলে
গ. 'বিপদে মোরে রক্ষা কর'
ঘ. 'অন্ধজনে দেহ আলো'

(৫) কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

ক. আমি স্কুলে যাচ্ছি
খ. সে ঢাকা যাবে
গ. ছেলেরা মাঠে বল খেলে
ঘ. তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক

(৬) কোন বাক্যে ভাববাচ্যের কর্তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

ক. সে গ্রামে যাবে
খ. তাকে গ্রামে যেতে হবে
গ. ছুটি হলে ঘণ্টা বাজে
ঘ. আমার যাওয়া হবে না

(৭) কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?

ক. তাকে আমরা চিনি না
খ. 'দুধকে আমরা দুগ্ধ বলি'
গ. 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে'
ঘ. লাঙ্গাল দ্বারা জমি চাষ করা হয়

(৮) কোন বাক্যে কর্তায় এ-বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

ক. পাগলে কী না বলে
খ. বনে বাঘ আছে
গ. ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে
ঘ. 'অন্ধজনে দেহ আলো'

২। কারক বলতে কী বোঝ? কারক নির্বাচনে শব্দ বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলা শব্দ বিভক্তিগুলোর নাম লেখ এবং বচন অনুসারে তাদের সাজাও।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে -------- বিভক্তি যুক্ত হয় না।

খ. স্বরান্ত শব্দের উত্তর ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয় ‘য়’ অথবা --------।

গ. বাংলা শব্দে, অ, আ এবং এ-কারান্ত শব্দে ষষ্ঠীর এক বচনে শুধু ‘র’ যুক্ত হয়, --- যুক্ত হয় না।

৫। সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।

(ক) প্রযোজক কর্তা (খ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (গ) বিধেয় কর্ম (ঘ) ভাবে সপ্তমী

(ঙ) গৌণ কর্ম (চ) অভিব্যাপক অধিকরণ (ছ) নামধাতুজ কর্মকারক।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।

(১) আজ আর **আমার** যাওয়া হবে না।

(২) গোয়ালা **গরু** দোহন করে।

(৩) নিজের **চেষ্টায়** বড় হও।

(৪) শিকারি বিড়াল **গোঁফে** চেনা যায়।

(৫) **বাবাকে** বড্ড ভয় পাই।

(৬) **বোঁটা-আলগা** ফল গাছে থাকে না।

(৭) লোকটা **কান্নায়** ভেঙ্গে পড়ল।

৭। বাক্যে উদাহরণ দাও।

(ক) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি (খ) অপাদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি

(গ) করণ কারকে ‘তে’ বিভক্তি (ঘ) কর্তৃকারকে ‘তে’ বিভক্তি

৮। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেখিয়ে বাক্য গঠন কর।

৯। সম্বন্ধ পদকে কারক বলা যায় কিনা, উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।

১০। খাঁটি বাংলা সম্বোধন পদের ব্যবহার দেখিয়ে দুটি বাক্য রচনা কর।

১১। বিভিন্ন কারকে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার দেখাও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে **অনুসর্গ** বা **কর্মপ্রবচনীয়** বলে।

অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা 'কে' এবং 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন–

বিনা : দুঃখ **বিনা** সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)

সনে : ময়ূরীর **সনে** নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

দিয়ে : তোমাকে **দিয়ে** আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার 'কে' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন–

প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, ওপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, ভিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মতো, নিকট, অধিক, পক্ষে, দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর, ভেতর ইত্যাদি।

এদের মধ্যে দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, হইতে (হতে), চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রভৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। কারক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

১.	বিনা/বিনে	:	কর্তৃ কারকের সঙ্গে – তুমি **বিনা** (**বিনে**) আমার কে আছে?
	বিনি	:	করণ কারকের সঙ্গে – **বিনি** সুতায় গাঁথা মালা।
	বিহনে	:	উদ্যম **বিহনে** কার পুরে মনোরথ?
২.	সহ	:	সহগামিতা অর্থে – তিনি **পুত্রসহ** উপস্থিত হলেন।
	সহিত	:	সমসূত্রে অর্থে – **শত্রুর সহিত** সন্ধি চাই না।
	সনে	:	বিরুদ্ধগামিতা অর্থে – 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ **সনে**।'
	সঙ্গে	:	তুলনায় – মায়ের **সঙ্গে** এ মেয়ের তুলনা হয় না।
৩.	অবধি	:	পর্যন্ত অর্থে – সন্ধ্যা **অবধি** অপেক্ষা করব।
৪.	পরে	:	স্বল্প বিরতি অর্থে – এ ঘটনার **পরে** আর এখানে থাকা চলে না।
	পর	:	দীর্ঘ বিরতি অর্থে –শরতের **পরে** আসে বসন্ত।

৫.	পানে	:	প্রতি, দিকে অর্থে – ঐ তো ঘর **পানে** ছুটেছেন।
			‘শুধু তোমার মুখের **পানে** চাহি বাহির হনু।’
৬.	মতো	:	ন্যায় অর্থে – বেকুবের **মতো** কাজ করো না।
	তরে	:	মত অর্থে – এ জন্মের **তরে** বিদায় নিলাম।
৭.	পক্ষে	:	সক্ষমতা অর্থে – রাজার **পক্ষে** সব কিছুই সম্ভব।
			সহায় অর্থে – আসামির **পক্ষে** উকিল কে?
৮.	মাঝে	:	মধ্যে অর্থে – ‘সীমার **মাঝে** অসীম তুমি’।
			একদেশিক অর্থে – এ দেশের **মাঝে** একদিন সব ছিল।
			ক্ষণকাল অর্থে – নিমেষ **মাঝেই** সব শেষ।
	মাঝারে	:	ব্যাপ্তি অর্থে – ‘আছ তুমি প্রভু, জগৎ **মাঝারে**।’
৯.	কাছে	:	নিকটে অর্থে – আমার **কাছে** আর কে আসবে?
			কর্মকারকে ‘কে’ বোঝাতে – ‘রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের **কাছে**।’
১০.	প্রতি	:	প্রত্যেক অর্থে – মণ**প্রতি** পাঁচ টাকা লাভ দেব।
			দিকে বা ওপর অর্থে – ‘নিদারুণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব **প্রতি**।’
১১.	হেতু	:	নিমিত্ত অর্থে –‘কী **হেতু** এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’
	জন্যে	:	নিমিত্ত অর্থে – ‘এ ধন–সম্পদ তোমার **জন্যে**।’
	সহকারে	:	সঙ্গে অর্থে – আগ্রহ **সহকারে** কহিলেন।
	বশত	:	কারণে অর্থে – দুর্ভাগ্য**বশত** সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উত্তরের সর্বোত্তমটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(১) অনুসর্গ সাধারণত কোথায় বসে?

ক. শব্দের পূর্বে　　　　গ. শব্দের মধ্যে

খ. শব্দের পরে　　　　ঘ. বাক্যের শেষে

(২) অনুসর্গ কী?

ক. শব্দ–বিভক্তি গ. উপসর্গ

খ. ক্রিয়া–বিভক্তি ঘ. অব্যয়

(৩) 'শরতের পর আসে বসন্ত'। এখানে 'পর' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দীর্ঘ বিরতি গ. বিরতি

খ. অল্প বিরতি ঘ. নৈকট্য

(৪) 'কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।' – 'হেতু' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক. ব্যাপার গ. নিমিত্ত

খ. প্রার্থনা ঘ. প্রসঙ্গ

(৫) এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল। এখানে 'মাঝে'–অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সর্বত্র গ. মধ্যে

খ. একদেশিক ঘ. ব্যাপ্তি

(৬) তোমার তরে এনেছি মালা গাঁথিয়া। –এখানে 'তরে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. মত গ. মধ্যে

খ. নিকট ঘ. নিমিত্ত

(৭) 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।'–এখানে 'সনে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. বিরুদ্ধগামিতা গ. প্রতি

খ. সঙ্গে ঘ. হেতু

(৮) 'বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা'। – এখানে 'বিনে' কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. সঙ্গে গ. ব্যতিরেকে

খ. প্রয়োজন ঘ. আবশ্যিকতা

(৯) 'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।' – এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বাইরে গ. মধ্যে

খ. ব্যাপ্তি ঘ. সঙ্গে

(১০) অনুসর্গ কী করে?

ক. বিভক্তির কাজ করে
খ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে
গ. শব্দের অর্থ স্পষ্টতর করে
ঘ. বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে

২। অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বল।

৩। অনুসর্গ এবং খাঁটি বাংলা শব্দ বিভক্তির পার্থক্য উদাহরণসহ নির্দেশ কর।

৪। বাংলা ভাষায় কোন কোন অনুসর্গ কারক–বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে?

নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে স্থূলাক্ষরে লিখিত অনুসর্গগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রতিটি বাক্যের ডান দিকে লেখ।

(ক) শরতের পর আসে হেমন্ত ।

(খ) বেকুবের মতো বলেছ।

(গ) গরিবের পক্ষে কথা বলার লোক নেই।

(ঘ) সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।

(ঙ) মায়ের কাছে কথাটি শুধাব।

(চ) 'নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিরাট উল্লাসে ।
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।

(ছ) ওর সনে আমার আড়ি।

(জ) মণপ্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।

(ঞ) 'সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য প্রকরণ

বাক্যের লক্ষণ ও প্রকারভেদ : ভাষার মূল উপকরণ বাক্য এবং বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।
যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা আবশ্যক। এ ছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখণ্ড ভাব পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন –

(১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসত্তি এবং (৩) যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা–ই **আকাঙ্ক্ষা**। যেমন – 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে'– এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু ইচ্ছা থাকে। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসত্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন –

কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন –

কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

৩. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম **যোগ্যতা**। যেমন – বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। – এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।

কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে।' – বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

(ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি–প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

শব্দ	**রীতিসিদ্ধ**	**প্রকৃতি + প্রত্যয়**	**প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ**
১. বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
২. তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, বিশেষ কোনো শস্যের রস।

(খ) দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন – তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। (চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলা 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

(গ) উপমার ভুল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন –

আমার হৃদয়–মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়–ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

(ঘ) বাহুল্য–দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন –
দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। 'আলেমগণ' বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে 'সব' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য–দোষ সৃষ্টি করেছে।

(ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগ্‌ধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন – 'অরণ্যে রোদন' (অর্থ : নিষ্ফল আবেদন)–এর পরিবর্তে যদি বলা হয়।, 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

(চ) গুরুচণ্ডালী দোষ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। 'গরুর গাড়ি', 'শবদাহ', 'মড়াপোড়া' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে 'গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে **উদ্দেশ্য** এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে **বিধেয়** বলে। যেমন –

খোকা এখন	বই পড়ছে
(উদ্দেশ্য)	(বিধেয়)

বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন –

সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুখী। – বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ।

মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায়। – ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

- একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।
- উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত **উদ্দেশ্য** বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ:	**সম্প্রসারণ**	**উদ্দেশ্য**	**বিধেয়**
১. বিশেষণ যোগে–	কুখ্যাত	দস্যুদল	ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে–	হাসিমের	ভাই	এসেছে।
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে–	যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী,	তারাই	উন্নতি করে।
৪. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ যোগে–	চাটুকার পরিবৃত হয়েই	বড় সাহেব	থাকেন।
৫. বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে–	যার কথা তোমরা বলে থাক,	তিনি	এসেছেন।
বিধেয়ের সম্প্রসারণ:	**উদ্দেশ্য**	**সম্প্রসারণ**	**বিধেয়**
১. ক্রিয়া বিশেষণ যোগে–	ঘোড়া	দ্রুত	চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে–	জেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
৩. কারকাদি যোগে–	ভুবনের	ঘাটে ঘাটে	ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে–	তিনি	যে ভাবেই হোক	আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষণ যোগে–	ইনি	আমার বিশেষ	অন্তরঙ্গ বন্ধু (হন)।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্য তিন প্রকার : (১) সরল বাক্য, (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, (৩) যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে **সরল বাক্য** বলে। যথা – **পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।** এখানে **'পদ্মফুল'** উদ্দেশ্য এবং **'জন্মে'** বিধেয়।

এ রকম : বৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও। খোকা আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে। স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন (বিধেয়)। বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা–

আশ্রিত বাক্য	**প্রধান খন্ডবাক্য**
১. যে পরিশ্রম করে,	সে–ই সুখ লাভ করে।
২. সে যে অপরাধ করেছে,	তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

আশ্রিত খন্ডবাক্য তিন প্রকার : (ক) বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য, (খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য, (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খন্ডবাক্য।

ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Noun clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :

–**আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম**, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত)

তদ্রূপ : তিনি বাড়ি আছেন কি না, আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না।

(খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য (Adjective clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা :

–লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি 'সেই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।

তদ্রূপ : '**খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি**, আমার দেশের মাটি'।

'**ধনধান্য পুষ্পে ভরা**, আমাদের এই বসুন্ধরা।'
যে এ সভায় অনুপস্থিত, সে বড় দুর্ভাগা।

গ) ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য (Adverbial clause) : যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন –

'**যতই করিবে দান**, তত যাবে বেড়ে।'

তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।
যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।

৩. যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

জ্ঞাতব্য : যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন –

নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনোরূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

ক. সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা :

১. **সরল বাক্য** : ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য : যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

২. **সরল বাক্য** : তার দর্শনমাত্রই আমরা প্রস্থান করলাম।
মিশ্র বাক্য : যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।

৩. **সরল বাক্য** : ভিক্ষুককে দান কর।
মিশ্র বাক্য : যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

খ. মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর : মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

১. **মিশ্র বাক্য** : যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
সরল বাক্য : নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।

২. **মিশ্র বাক্য** : যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
সরল বাক্য : আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।

৩. **মিশ্র বাক্য** : যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
সরল বাক্য : মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন –

১. **সরল বাক্য** : তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

২. **সরল বাক্য** : পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য : এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

৩. **সরল বাক্য** : আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য : আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

ঘ. যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে

(১) বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

(২) অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

(৩) অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

(৪) কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

(১) **যৌগিক বাক্য** : সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য : সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

(২) **যৌগিক বাক্য** : তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

(৩) **যৌগিক বাক্য** : মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
সরল বাক্য : মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

ঙ. যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে 'যদি' কিংবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তাহলে' (তাহা হইলে) কিংবা 'তথাপি' অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
মিশ্র বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

(২) যৌগিক বাক্য : তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
মিশ্র বাক্য : যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তন করা যায়। যথা :

যৌগিক বাক্য : এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।
মিশ্র বাক্য : এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

চ. মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খন্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) **মিশ্র বাক্য** : যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

(২) **মিশ্র বাক্য** : যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য : বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

(৩) **মিশ্র বাক্য** : যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য : তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ

সংজ্ঞা : বাক্যের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণালীকে বাক্য **বিশ্লেষণ** বলে।

ক. সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

১. মহারাজ শুদ্ধোধনের পুত্র শাক্যসিংহ যৌবনে সংসার ত্যাগ করেন।

২. ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা) দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছিলেন।

ওপরে লিখিত বাক্য দুটিকে (১) উদ্দেশ্য, (২) উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, (৩) বিধেয়, (৪) বিধেয়ের সম্প্রসারক – এ চারটি অংশে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়
(১) মহারাজ শুদ্ধোধনের পুত্র	শাক্যসিংহ	যৌবনে সংসার	ত্যাগ করেন।
(২) ইসলামের প্রথম খলিফা	হযরত আবু বকর (রা)	দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব	দান করেছিলেন।

খ. মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ

মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রথমে প্রধান বাক্যটি প্রদর্শন করতে হয়।

২. খণ্ডবাক্য (গুলো) প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ উল্লেখ করতে হয়।

৩. প্রধান এবং অপ্রধান খণ্ডবাক্যের মধ্যে কোনো সংযোজক পদ থাকলে তাও দেখাতে হয়। যেমন–আমি স্থির করলাম যে, এরূপ অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না। এখানে প্রধান বাক্য–(১) আমি স্থির করলাম; সংযোজক পদ–যে; বিশেষ্য–স্থানীয় খণ্ডবাক্য – (২) অল্প বয়স্ক বালককে পাঠাব না।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক বা সাপেক্ষ অব্যয়
(১)	আমি	অল্প বয়স্ক বালককে	স্থির করলাম	যে
(২)	(আমি)			
	(উহ্য)		পাঠাব না।	এবং

গ. যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রত্যেকটি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করতে হবে।

২. কোনো সংযোজক অব্যয় থাকলে তা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন – ত্যাগ এবং জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। এখানে দুটি বাক্য আছে। যেমন –

(১) ত্যাগ মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

(২) জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। বাক্য দুটির সংযোজক অব্যয় 'এবং'।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক অব্যয়
(১)	ত্যাগ	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	এবং
(২)	জ্ঞান	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	

বাক্য সংক্ষেপণ

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে **বাক্য সংক্ষেপণ** বলে। এটি বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশেরই নামান্তর। এখানে বাক্য সংকোচনের উদাহরণ দেওয়া গেল।

বাক্য সংক্ষেপণের বা বাক্য সংকোচনের উদাহরণ

অকালে পক্ব হয়েছে যা – অকালপক্ব।

অক্ষির সমক্ষে বর্তমান – প্রত্যক্ষ।

অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার – অনভিজ্ঞ।

অহংকার নেই যার – নিরহংকার।

অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম।

অনুতে (বা পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত।

আকাশে বেড়ায় যে – আকাশচারী, খেচর।

আচারে নিষ্ঠা আছে যার – আচারনিষ্ঠ।

আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা – আত্মকেন্দ্রিক।

আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে–পণ্ডিতম্মন্য।

আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার – আস্তিক।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার – নাস্তিক।
ইতিহাস রচনা করেন যিনি – ঐতিহাসিক।
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা।
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে – জিতেন্দ্রিয়।
ঈষৎ আমিষ (আঁষ) গন্ধ যার – আঁষটে।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না – অকৃতজ্ঞ।
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন।
একই মাতার উদরে জাত যে –সহোদর।
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত – একাদিক্রমে।
কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী – কর্মঠ।
কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না – অনিবার্য।
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত –চাক্ষুষ।
জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্মৃত।
তল স্পর্শ করা যায় না যার – অতলস্পর্শী।
দিনে যে একবার আহার করে – একাহারী।
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার – নশ্বর।
নদী মেখলা যে দেশের – নদীমেখলা।
নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে – নাবিক।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক।
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় – ওষধি।
বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী।
বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন।
মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমূর্ষু।
যা দমন করা যায় না – অদম্য।
যা দমন করা কষ্টকর – দুর্দমনীয়।
যা নিবারণ করা কষ্টকর – দুর্নিবার।
যা পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব।
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি।

যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে – সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব।
যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই – অকুতোভয়।
যার আকার কুৎসিত – কদাকার।
যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে – অযত্নলব্ধ।
যা বার বার দুলছে – দোদুল্যমান।
যা দীপ্তি পাচ্ছে – দেদীপ্যমান।
যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন – অনন্যসাধারণ।
যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন – অদৃষ্টপূর্ব।
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়।
যা কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্লভ।
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে – অধীত।
যা জলে চরে – জলচর।
যা স্থলে চরে – স্থলচর।
যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর।
যা বলা হয়নি – অনুক্ত।
যা কখনো নষ্ট হয় না – অবিনশ্বর।
যা মর্ম স্পর্শ করে – মর্মস্পর্শী।
যা বলার যোগ্য নয় – অকথ্য।
যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ।
যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না – অজ্ঞাতকুলশীল।
যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না – বর্ণচোরা।
যা চিন্তা করা যায় না – অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য।
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু–বন্ধুর।
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়–ব্যয়বহুল।
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় – নাতিশীতোষ্ণ।
যার বিশেষ খ্যাতি আছে – বিখ্যাত।
যা আঘাত পায়নি – অনাহত।
যা উদিত হচ্ছে – উদীয়মান।
যার অন্য উপায় নেই – অনন্যোপায়।
যার কোনো উপায় নেই – নিরুপায়।

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে– বর্ধিষ্ণু।
যা পূর্বে শোনা যায়নি – অশ্রুতপূর্ব।
যে শুনেই মনে রাখতে পারে – শ্রুতিধর।
যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে – উদ্বাস্তু।
যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় – স্বয়ংবরা।
যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না – বনস্পতি।
যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে – হাতুড়ে।
যে নারীর সন্তান বাঁচে না – মৃতবৎসা।
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা।
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে – পরগাছা।
যে পুরুষ বিয়ে করেছে – কৃতদার।
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি – অনূঢ়া।
যে ক্রমাগত রোদন করছে – রোরুদ্যমান ।
যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না– অপরিণামদর্শী।
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী।
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক (বা বিসংবাদ) নেই – অবিসংবাদিত।
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ – শ্বাপদসংকুল।
যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্মী।
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় – সর্বংসহা।
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে – বীরপ্রসূ।
যে নারীর কোনো সন্তান হয় না – বন্ধ্যা।
যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে – কাকবন্ধ্যা।
যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর – সুদর্শন।
যে রব শুনে এসেছে – রবাহুত।
লাভ করার ইচ্ছা – লিপ্সা।
শুভ ক্ষণে জন্ম যার – ক্ষণজন্মা।
সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা – প্রত্যুদ্গমন।
সকলের জন্য প্রযোজ্য – সর্বজনীন।
হনন করার ইচ্ছা – জিঘাংসা।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উত্তরের সর্বোত্তমটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(১) ভাষার মূল উপকরণ কী?

ক. ধ্বনি　　গ. বাক্য
খ. শব্দ　　ঘ. বর্ণ

(২) বাক্যে এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে?

ক. আসত্তি　　গ. আকাঙ্ক্ষা
খ. যোগ্যতা　　ঘ. আসক্তি

(৩) 'শবপোড়া' শব্দটিতে কী দোষ দেখা যায়?

ক. গুরুচণ্ডালী　　গ. আকাঙ্ক্ষার ভুল প্রয়োগ
খ. উপমা প্রয়োগে ভুল　　ঘ. দুর্বোধ্যতা

(৪) কোনটি বাগধারার শব্দ পরিবর্তনজনিত ভুলের উদাহরণ?

ক. ঘোড়ার ডিম　　গ. গৌরীসেনের টাকা
খ. গোড়ায় গলদ　　ঘ. ঘোটকের ডিম্ব

(৫) কোন বাক্যাংশটি গুরুচণ্ডালী দোষযুক্ত?

ক. ঘোড়ার গাড়ি　　গ. শবদাহ
খ. ঘোটকের গাড়ি　　ঘ. মড়াপোড়া

(৬) উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে–এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?

ক. উপকার–স্বীকারী　　গ. কৃতঘ্ন
খ. অকৃতজ্ঞ　　ঘ. কৃতজ্ঞ

(৭) নষ্ট হওয়া স্বভাব যার –এক কথায় কী হবে?

ক. অবিনশ্বর　　গ. নষ্টস্বভাব
খ. নশ্বর　　ঘ. বিনষ্ট

(৮) যা পূর্বে দেখা যায়নি – এক কথায় কী হবে?

ক. অদৃষ্ট　　গ. অপূর্ব
খ. দৃষ্টপূর্ব　　ঘ. অদৃষ্টপূর্ব

২। বাক্য বলতে কী বোঝ? কোনো একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

৩। 'শব্দের যোগ্যতা বিচার রীতিমত কঠিন কাজ, কেননা শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িত থাকে।' –এ উক্তিটির সমর্থনে তোমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর।

৪। কী কী উপায়ে বিধেয়ের সম্প্রসারণ হতে পারে? স্বরচিত বাক্যে উপায়সমূহের উদাহরণ দাও।

৫। সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও :

(ক) মিশ্রবাক্য, (খ) আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য, (ঘ) ক্রিয়া–বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য

৬। যৌগিক বাক্য ও সরল বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক কী? উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দাও।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোকে নির্দেশিত বন্ধনীযুক্ত বাক্যে রূপান্তর কর

(ক) সত্য কথা বল নি, সুতরাং বিপদে পড়েছ। (সরল বাক্যে)

(খ) অপরাধ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না। (মিশ্র বাক্যে)

(গ) যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। (যৌগিক বাক্যে)

(ঘ) যখন দুর্দিন আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক বাক্যে)

(ঙ) যে ভিক্ষা করতে এসেছে, তাকে ভিক্ষা দাও। (সরল বাক্যে)

(চ) তাকে দেখা মাত্রই আমরা চলে গেলাম। (মিশ্র বাক্যে)

৮। নিম্নলিখিত বাক্য তিনটি বিশ্লেষণ কর :

(ক) যাঁরা সত্যিকার কর্মী, তাঁরাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হন।

(খ) মানব–সেবায় আত্মোৎসর্গ কর।

(গ) পথিক বিবেচনা করলেন যে, পথচারী মহিলাটি ঝড়–বৃষ্টির মধ্যে বিপদে পড়েছেন।

৯। বাক্য সংক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাক্যাংশের সংক্ষেপণ হতে পারে? উদাহরণসহ বিশদ আলোচনা কর।

১০। ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(ক) আকাশে চরে বেড়ায় যে : আকাশচারী/চিল/খেচর।

(খ) যে উপকারীর অপকার করে : অপকারক/কৃতঘ্ন/অকৃতজ্ঞ।

(গ) যা দমন করা যায় না : দুর্দম/দুর্দমনীয়/ অদম্য।

(ঘ) যা দীপ্তি পাচ্ছে : সন্দীপন/দীপ্তিমান/দেদীপ্যমান।

(ঙ) যা বলা হয়নি : অকথিত/অনুক্ত/অবাচ্য।

(চ) যার কোনো উপায় নেই : নাচার/অনুপায়/নিরুপায়।

(ছ) হনন করার ইচ্ছা : হননেচ্ছা/জিঘাংসা/জিজ্ঞাসা।

১১। এক শব্দে পরিণত কর এবং ঐ শব্দ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :

(ক) সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত।

(খ) লাভ করার ইচ্ছা।

(গ) যে ক্রমাগত কাঁদছে।

(ঘ) যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

(ঙ) যা বলার যোগ্য নয়।

(চ) যার স্বাভাবিক বর্ণ ধরা যায় না।

(ছ) যার আকার কুৎসিত।

(জ) যে গাছ অন্য গাছের ওপর নির্ভর করে বাঁচে।

(ঝ) যা আঘাত পায়নি।

(ঞ) যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে।

বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগভেদে অর্থ পার্থক্য

১. হাত

(ক) হাত আসা – কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে। (দক্ষতা)
(খ) হাত গুটান – হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? (কার্যে বিরতি)
(গ) হাত করা – সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে। (আয়ত্তে আনা)
(ঘ) হাত ছাড়া – টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না। (হস্তচ্যুত)
(ঙ) হাত থাকা – এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। (প্রভাব)

দ্রষ্টব্য : বাগ্‌ধারা গঠনে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগও বলে।

'হাত' শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

(ক) হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) : এ টাকা কটিই ছিল আমার হাতের পাঁচ।
(খ) হাতে হাতে (অবিলম্বে) : হাতে হাতে এ কাজের ফল পাবেন।
(গ) হাতে খড়ি (বিদ্যারম্ভ) : এ মাসেই খোকার হাতে খড়ি হবে।
(ঘ) হাতে কলমে (স্বহস্তে, কার্যকর ভাবে) : হাতে–কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

২. মাথা

(ক) মাথা ধরা – রোগ বিশেষ
(খ) গাঁয়ের মাথা – মোড়ল।
(গ) মাথা ব্যথা – আগ্রহ
(ঘ) মাথা খাওয়া – শপথ করা।
(ঙ) মাথা দেওয়া – দায়িত্ব গ্রহণ
(চ) মাথা ঘামানো – ভাবনা করা।
(ছ) মাথাপিছু – জনপ্রতি

মাথা শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ			বাক্য গঠন
রাস্তার মাথায়	–	মিলন স্থলে।	**রাস্তার মাথায়** তার সঙ্গে দেখা।
মাথা গরম করা	–	রাগান্বিত হওয়া।	**রাগের মাথায়** কথাটা বলেছি।
রাগের মাথায়	–	হঠাৎ ক্রোধবশত।	**মাথা গরম** করে আর কী হবে?
মাথা হেঁট করা	–	লজ্জায় মাথা নিচু করা।	**মাথা হেঁট** হবে কেন?
মাথা উঁচু করে চলা	–	গর্বভরে চলা।	**মাথা উঁচু** করেই চলতে চাই।

বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগভেদে অর্থ পার্থক্য

১. হাত

(ক) হাত আসা – কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে। (দক্ষতা)

(খ) হাত গুটান – হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? (কার্যে বিরতি)

(গ) হাত করা – সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে। (আয়ত্তে আনা)

(ঘ) হাত ছাড়া – টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না। (হস্তচ্যুত)

(ঙ) হাত থাকা – এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। (প্রভাব)

দ্রষ্টব্য : বাগ্‌ধারা গঠনে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগও বলে।

'হাত' শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

(ক) হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) : এ টাকা কটিই ছিল আমার হাতের পাঁচ।

(খ) হাতে হাতে (অবিলম্বে) : হাতে হাতে এ কাজের ফল পাবেন।

(গ) হাতে খড়ি (বিদ্যারম্ভ) : এ মাসেই খোকার হাতে খড়ি হবে।

(ঘ) হাতে কলমে (স্বহস্তে, কার্যকর ভাবে) : হাতে–কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

২. মাথা

(ক) মাথা ধরা – রোগ বিশেষ

(খ) গাঁয়ের মাথা – মোড়ল।

(গ) মাথা ব্যথা – আগ্রহ

(ঘ) মাথা খাওয়া – শপথ করা।

(ঙ) মাথা দেওয়া – দায়িত্ব গ্রহণ

(চ) মাথা ঘামানো – ভাবনা করা।

(ছ) মাথাপিছু – জনপ্রতি

মাথা শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ			বাক্য গঠন
রাস্তার মাথায়	–	মিলন স্থলে।	**রাস্তার মাথায়** তার সঙ্গে দেখা।
মাথা গরম করা	–	রাগান্বিত হওয়া।	**রাগের মাথায়** কথাটা বলেছি।
রাগের মাথায়	–	হঠাৎ ক্রোধবশত।	**মাথা গরম** করে আর কী হবে?
মাথা হেঁট করা	–	লজ্জায় মাথা নিচু করা।	**মাথা হেঁট** হবে কেন?
মাথা উঁচু করে চলা	–	গর্বভরে চলা।	**মাথা উঁচু** করেই চলতে চাই।

বিশেষণ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

১. কাঁচা

কাঁচা আম	–	অপরিপক্ব আম।	কাঁচা খাতা	–	খসড়া।
কাঁচা কথা	–	গুরুত্বহীন কথা।	কাঁচা ইট	–	অদগ্ধ ইট।
কাঁচা ঘুম	–	অল্প ক্ষণের ঘুম।	কাঁচা চুল	–	কালো চুল।
কাঁচা বয়স	–	অপরিণত বয়স।	কাঁচা সোনা	–	নিখাদ স্বর্ণ।

বাক্য গঠন : কাঁচা সোনার মতো তার গায়ের রং।

কাঁচা (আনাড়ি) লোকই কাঁচা (অনিপুণভাবে) কাজ করে থাকে।

বাক্যে 'পাকা' বিশেষণ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

পাকা কথা (শেষ সিদ্ধান্তসূচক) চাই।

পাকা বন্দোবস্ত (স্থায়ী) করে এসেছি।

এ হচ্ছে পাকা রাঁধুনির (দক্ষ) রান্না।

ইঁচড়ে পাকা (অকালে পরিপক্ব) ছেলেদের কথা অসহ্য।

একেবারে পাকা হাতের (দক্ষ লেখকের) লেখা।

আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি (হক নষ্ট করা) যে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?

'করা' ক্রিয়াপদের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

মনে করলাম এবার তীর্থে যাব। (সংকল্প করা)

সে ফুটবল খেলায় নাম করেছে। (যশস্বী হওয়া)

টাকা করে নাম কিনতে চাও? (খ্যাতি লাভের চেষ্টা করা)

চাকরি পাওয়ার কোনো জো করে উঠতে পারিনি। (সুযোগ পাওয়া)

'ধরা' ক্রিয়াপদের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

কান ধরা	–	কর্ণ মর্দন করা।	মনে ধরা	–	পছন্দ হওয়া।
দোষ ধরা	–	অপরাধ গণনা করা।	আগুন ধরা	–	আগুন লাগা।
পথ ধরা	–	উপায় দেখা।	ম্যাও ধরা	–	দায়িত্ব নেওয়া।
হাতে–পায়ে ধরা	–	অনুরোধ করা।	গোঁ ধরা	–	একগুঁয়েমি করা।
গলা ধরা	–	কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়া।(কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া)			

দ্রষ্টব্য : শব্দাত্মক ও পদাত্মক বাগ্‌ধারার অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন–

গা সওয়া	–	অভ্যস্ত হওয়া	গা লাগা	–	মনোযোগ দেওয়া।
গায়ে সওয়া	–	দেহে সহ্য হওয়া।	গায়ে লাগা	–	অনুভূত হওয়া।
পায়ে পড়া	–	ক্ষমা প্রার্থনা করা।	হাত আসা	–	অভ্যস্থ হওয়া।
পায়ে পড়া	–	খোশামুদে।	হাতে আসা	–	আয়ত্ত হওয়া।
রোগ ধরা	–	রোগ নির্ণয়।			
রোগ ধরা	–	রোগাক্রান্ত হওয়া।			

বাগ্‌ধারার ব্যবহার

অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ, অকেজো) – অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটার ওপর এ কাজের দায়িত্ব দিও না।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) – অনেক রোগভোগের পর শয়তানটা শেষ পর্যন্ত অক্কা পেয়েছে।

অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান) – ডাকাতি মামলার আসামি হওয়ায় করিম গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।

অগাধ জলের মাছ (সুচতুর ব্যক্তি) – সরল মনে হলেও লোকটা আসলে অগাধ জলের মাছ।

অর্ধচন্দ্র (গলা ধাক্কা) – শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।

অন্ধের যষ্ঠি / **অন্ধের নড়ি** (একমাত্র অবলম্বন) – বিধবার একমাত্র সন্তান তার অন্ধের যষ্ঠি/অন্ধের নড়ি।

অগ্নিশর্মা (নিরতিশয় ক্রুদ্ধ) – তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন।

অগ্নিপরীক্ষা (কঠিন পরীক্ষা) – জাতিকে এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে, ভয় পেলে চলবে না।

অন্ধকারে ঢিল মারা (আন্দাজে কাজ করা) – অন্ধকারে ঢিল মেরে সব কাজ ঠিকভাবে করা যায় না।

অকূল পাথার (ভীষণ বিপদ) – অকূল পাথারে আল্লাহ্‌ই একমাত্র সহায়।

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্মতি জ্ঞাপন) – অনুরোধে ঢেঁকি গেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি এ কাজ করতে পারব না।

অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা) – অদৃষ্টের পরিহাসে রাজাও ভিখারি হয়।

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী (সামান্য বিদ্যার অহংকার) – কিছুই জানে না, আবার দেমাক কত – অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী আর কি।

অনধিকার চর্চা (সীমার বাইরে পদক্ষেপ) – কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমি অনধিকার চর্চা করি না।

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – কৃপণের নিকট চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।

অহিনকুল সম্বন্ধ (ভীষণ শত্রুতা) – দুভাইয়ের মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকার দেখা (দিশেহারা হয়ে পড়া) – এ বিপদে আমি যে সব অন্ধকার দেখছি।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) – তোমার দেখা পাওয়াই ভার, অমাবস্যার চাঁদ হয়ে পড়েছ।

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – মূর্খরাই আকাশ কুসুম চিন্তা করে।

আকাশ পাতাল (প্রচুর ব্যবধান) – ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

আক্কেল সেলামি (নির্বুদ্ধিতার দণ্ড) – বিনা টিকেটে রেলগাড়িতে চড়ে আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক) – যুদ্ধের বাজারে দেদার টাকা পয়সা কামাই করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি) – হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাপ–মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

আদায় কাঁচকলায় (শত্রুতা) – তার সঙ্গে আমার আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, সে আমার দুশমন।

আদা জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) – কাজটি শেষ করার জন্য সে আদা জল খেয়ে লেগেছে।

আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত) – ইঁচড়ে পাকা ছেলেটার কথা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – ও হচ্ছে ধনীর দুলাল, আমড়া কাঠের ঢেঁকি, ওকে দিয়ে কিছুই হবে না।

আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – ব্যাংক ফেল করেছে শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

আমতা আমতা করা (ইতস্তত করা, দ্বিধা করা) – আমতা আমতা না করে স্পষ্ট কথায় দোষ স্বীকার কর।

আটকপালে (হতভাগ্য) – ছেলেটা এতিম, আটকপালে।

আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা) – তোমার তো আঠার মাসে বছর, কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পার না।

আলালের ঘরের দুলাল (অতি আদরে বড় লোকের নষ্ট পুত্র) – বড়লোকের ঘরে দু–একজন আলালের ঘরের দুলাল মিলবেই।

আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) – চাটুকাররা ধনী ব্যক্তিদের কথায় কথায় আকাশে তোলে।

আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি কেচ্ছা) – চাঁদে যাওয়ার কথাটা একসময় ছিল আষাঢ়ে গল্প।

ইঁদুর কপালে (নিতান্ত মন্দ ভাগ্য) – আমার মতো ইঁদুর কপালে লোকের দাম এক কানাকড়িও না।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব) – অতবড় মানুষটার সাথে তর্ক করছে, কী ইঁচড়ে পাকা ছেলে বাবা।

ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – সৃষ্টিকর্তার নিকট সব মানুষই সমান, ইতর বিশেষ নেই।

উত্তম মধ্যম (প্রহার, পিটুনি) – গৃহস্থ চোরটাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিল।

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – এমন উড়নচণ্ডী হলে দুদিনে টাকাকড়ি সব শেষ হবে।

উভয় সংকট – 'শাখের করাত' দেখ।

উলুবনে মুক্ত ছড়ানো (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান) – তাকে সদুপদেশ দান, উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর মতোই নিষ্ফল।

উড়োচিঠি (বেনামি পত্র) – ডাকাতরা জমিদার বাড়িতে উড়োচিঠি দিয়ে ডাকাতি করেছিল।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকারীর অধিকার) – লোকটার মাতব্বরি দেখলে গা জ্বলে যায়। ও এখানকার লোক নয়, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

একক্ষুরে মাথা মুড়ানো (একই স্বভাবের) – সকলেই একক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছে দেখছি, পরীক্ষায় সবাই ফেল করেছে।

একচোখা (পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট) – একচোখা লোকের কাছে সুবিচার পাওয়া যায় না।

এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারই আসে না) – আমাকে ফাঁকি দিলে, মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না।

এলোপাতাড়ি (বিশৃঙ্খলা) – এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লে শত্রুদলের ক্ষতি করতে পারবে না।

এসপার ওসপার (মীমাংসা) – চুপ করে থেকে লাভ কী, এসপার ওসপার একটা করে ফেল।

একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যের বিষয়) – এখন তার একাদশে বৃহস্পতি, ধুলোমুঠোও সোনামুঠো হচ্ছে।

এলাহি কান্ড (বিরাট আয়োজন) – বড় বাড়িতে বিয়ে, সেতো এক এলাহি কান্ড হবে।

কলুর বলদ (একটানা খাটুনি) – কলুর বলদের মতো সংসারের চাকায় ঘুরে মরছি।

কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা) – কারও মনে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলিনি, এটা একটা কথার কথা।

কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ) – লটারির টিকেট কিনে সে তার কপাল ফেরাতে চায়।

কত ধানে কত চাল (হিসাব করে চলা) – নিজেকে তো আর উপার্জন করতে হয় না, কত ধানে কত চাল হয় বুঝবে কেমন করে।

কড়ায় গন্ডায় (সম্পূর্ণ, পুরোপুরি) – সে কড়ায় গন্ডায় তার পাওনা বুঝে নিল।

কান খাড়া করা (মনোযোগী হওয়া) – আমি কী বলি তা শোনার জন্য সে কান খাড়া করে রইল।

কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) – কাঁচা পয়সা পাও কি না, তাই খরচ করতে বাধে না।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অসম্ভব বস্তু) – ঐ হাড়কিপ্টে করবে দান, কাঁঠালের আমসত্ত্ব আর কি।

কূপমণ্ডূক (ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন) – তুমি তো কূপমণ্ডূক, 'ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ'।

কেতাদুরস্ত (পরিপাটি) – কথাবার্তায়, পোশাকপরিচ্ছদে কেতাদুরস্ত হলেও সে অন্তঃসারশূন্য।

কাঠের পুতুল (নির্জীব, অসার) – রাজা কাঠের পুতুলের মতো সিংহাসনে বসেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীই দেশ শাসন করতেন।

কথায় চিঁড়ে ভেজা (ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন) – কাজটি করাতে হলে নগদ কিছু ঢালো, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

কান পাতলা (সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ) – কান পাতলা লোকের অধীনে কাজ করা কঠিন।

কাছা ঢিলা (অসাবধান) – কাছা ঢিলা লোককে কোনো বড় দায়িত্ব দিতে নেই।

কুলকাঠের আগুন (তীব্র জ্বালা) – তোমার কথার খোঁচায় আমার সারা দেহে কুলকাঠের আগুন জ্বলছে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ (সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি) – ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

কেউকেটা (সামান্য) – ও একেবারে কেউকেটা লোক নয়, ওর সঙ্গে লাগতে যেও না।

কেঁচে গণ্ডুস (পুনরায় আরম্ভ) – সবটাই ভুল হয়েছে, আবার কেঁচে গণ্ডুস করতে হবে দেখছি।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) – লোকটা এত অত্যাচারেও মরেনি, কৈ মাছের প্রাণ দেখছি।

খয়ের খাঁ (চাটুকার) – তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের খাঁ, তিনি যা বলেন তুমি তাই বল।

খণ্ড প্রলয় (তুমুল কাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার) – সামান্য ঘটনা থেকে এমন খণ্ড প্রলয় হবে ভাবিনি।

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) – গড্ডলিকা প্রবাহে যারা গা ভাসিয়ে দেয়, আমি তাদের দলে নেই।

গদাই লস্করি চাল (অতি ধীর গতি, আলসেমি) – এমন গদাই লস্করি চালে চললে ট্রেন ফেল করবে।

গণেশ উল্টানো (উঠে যাওয়া, ফেল মারা) – কর্মচারীদের চুরির ফলে দোকানটা গণেশ উল্টিয়েছে।

গলগ্রহ (পরের বোঝাস্বরূপ থাকা) – কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কী কষ্ট, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

গোঁয়ার গোবিন্দ (নির্বোধ অথচ হঠকারী) – সে যেমন জেদি তেমনি রাগী, তার মতো গোঁয়ার গোবিন্দকে নিয়ে পথ চলা যায় না।

গোল্লায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া) – কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা গোল্লায় গেছে।

গোবর গণেশ (মূর্খ) – না জানে লেখাপড়া, না আছে বুদ্ধি – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ।

গাছে তুলে মই কাড়া (আশা দিয়ে আশ্বাস ভঙ্গ করা) – আমাকে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছ, একেই বলে গাছে তুলে মই কাড়া।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা) – গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে সংসার চলবে কেমন করে?

গোঁফ খেজুরে (নিতান্ত অলস) – গোঁফ খেজুরে লোক দিয়ে কোনো কাজই হয় না।

গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল) – অঙ্ক মিলবে কেমন করে? গোড়াতেই তো গলদ।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) – আশা করেছিলাম মামার সম্পত্তি পাব, এখন দেখছি সে গুড়ে বালি।

ঘর ভাঙানো (সংসার বিনষ্ট করা) – তোমার মতো ঘর ভাঙানো বৌ আর দেখিনি।

ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ) – টাকার লোভে ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না।

ঘোড়ারোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) – মাসে তিন হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গাড়ি কিনতে চাও, একেই বলে গরিবের ঘোড়ারোগ।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা) – অফিসের বড় সাহেবকে না জানিয়ে ছোট সাহেবকে বলা, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।

চাঁদের হাট (আনন্দের প্রাচুর্য) – ধনেজনে চৌধুরী সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।

চিনির বলদ (ভারবাহী তবে ফল লাভের অংশীদার নয়) – সংসারে চিনির বলদের মতো খেটে মরছি, কিছুই পাই না।

চোখের বালি (চক্ষুশূল) – বখাটে ছেলেটা সকলের চোখের বালি।

চোখের পর্দা (লজ্জা) – তোমার দেখছি চোখের পর্দা নেই; কেমন করে এ কাজ করলে?

ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – নিলামের মাল, তাই ছকড়া নকড়ায় বিক্রি হয়ে গেল।

ছাপোষা (অত্যন্ত গরিব) – আমার মতো ছাপোষা লোকের কোনো শখ থাকতে নেই।

ছিনিমিনি খেলা (নষ্ট করা) – পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলতে লজ্জা করল না?

ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু) – রত্নহার ছেলের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাবে।

জগাখিচুড়ি পাকানো (গোলমাল বাধানো) – ব্যাপারটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে সে সরে পড়ল।

জিলাপির প্যাঁচ (কুটিলতা) – ভালোমানুষ মনে হলেও তার ভেতরে রয়েছে জিলাপির প্যাঁচ।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ মতো কাজ করা) – ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পেরেছে বলেই সে কৃতকার্য হয়েছে।

টনক নড়া (চৈতন্যোদয় হওয়া/বুঝে ওঠা) – ব্যবসায় ক্ষতি হতেই তার টনক নড়ল।

ঠাট বজায় রাখা (অভাব চাপা রাখা) – অভাবে পড়লেও তিনি ঠাট বজায় রেখে চলেছেন।

ঠোঁটকাটা (বেহায়া) – তোমার মতো ঠোঁট কাটা ছেলে আর দেখিনি, মুখের ওপর এ কথা বললে।

ডুমুরের ফুল – 'অমাবস্যার চাঁদ' দেখ।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপন রাখার চেষ্টা) – ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে লাভ কী, ব্যাপারটা খুলে বল।

ঢাকের কাঠি (মোসাহেব) – 'খয়ের খা' দেখ।

তালকানা (বেতাল হওয়া) – চোখে চশমা, আর চশমা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা তালকানা লোক।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী বস্তু) – ঠুনকো বন্ধুত্ব স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়।

তামার বিষ (অর্থের কু প্রভাব) – হঠাৎ বড় লোক কি না, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছ।

থ বনে যাওয়া (স্তম্ভিত হওয়া) – তোমার কাণ্ড দেখে আমি তো থ বনে গেলাম।

দা–কুমড়া – 'অহিনকুল' দ্রষ্টব্য।

দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) – সাহেবের সাথে তোমার যখন এত দহরম মহরম, তখন কাজটা করিয়ে দাও ভাই।

দুমুখো সাপ (দুজনকে দুরকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী) – লোকটা একটা দুমুখো সাপ; আমাদের দুজনকে দুরকম কথা বলে দুজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে।

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – সুদিনে যে দুধের মাছি, দুর্দিনে তার সাক্ষাৎ মেলে না।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (সকলকে তুচ্ছ ভাবা) – বড়লোক হয়েছ বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করো না।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি (কৌশলে কার্যোদ্ধার) – এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা হবে ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

ননীর পুতুল (শ্রমবিমুখ) – ছেলেটি একেবারে ননীর পুতুল, একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠে।

নয়ছয় (অপচয়) – সে বাড়ি বিক্রির টাকাগুলো নয়ছয় করে ফেলল।

নেই আঁকড়া (একগুঁয়ে) – এমন নেই আঁকড়া ছেলে আর তো দেখিনি বাবা যা বলবে তাই!

পটল তোলা (অক্কা পাওয়া) – শয়তানটা পটল তুলেছে, এবার গাঁয়ের লোকের হাড় জুড়াবে।

পালের গোদা (দলপতি) – পুলিশ পালের গোদাকে ধরতে পারেনি, সাধারণ মানুষের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে।

পুকুরচুরি (বড় রকমের চুরি) – কিছু কর্মচারী পুকুরচুরি করে প্রতিষ্ঠানে লালবাতি জ্বালিয়েছে।

ফপর দালালি (অতিরিক্ত চালবাজি) – সবখানে ফপর দালালি চলে না, জায়গা বুঝে কাজ করতে হয়।

ফোড়ন দেওয়া (টিপ্পনি কাটা) – কথায় কথায় ফোড়ন দিলে কাজ করা দায় হয়ে উঠবে।

বক ধার্মিক/বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড সাধু) – মুখে ধর্মের কথা বললেও লোকটা আসলে বক ধার্মিক।

বর্ণচোরা (কপট ব্যক্তি) – লোকটা বর্ণচোরা, তার আসল রূপ ধরা যায় না।

বালির বাঁধ (অস্থায়ী বস্তু) – 'বড়র পিরিতি যেন বালির বাঁধ।'

বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ গ্রহণ) – এ অফিসের কিছু কর্মচারী বাঁ হাতের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

বাঘের দুধ/চোখ (দুঃসাধ্য বস্তু)	–	টাকায় বাঘের দুধ মেলে।
বিসমিল্লায় গলদ	–	'গোড়ায় গলদ' দ্রষ্টব্য।
বুদ্ধির ঢেঁকি (নিরেট মূর্খ)	–	'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।'
ব্যাঙের আধুলি (সামান্য সম্পদ)	–	এই সামান্য কটা টাকা ব্যাঙের আধুলি আর কি।
ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা)	–	জেল খাটা আসামিকে দেখাচ্ছ জেলের ভয়– ব্যাঙের আবার সর্দি!
ভরাডুবি (সর্বনাশ)	–	আমি কারো ভরাডুবি করিনি যে সবাই আমার বিরুদ্ধে লেগেছে।
ভূতের বেগার (অযথা শ্রম)	–	জীবনভর ভূতের বেগার খেটে গেলাম, লাভ কিছুই হলো না।
ভিজে বিড়াল (কপটাচারী)	–	সমাজে ভিজে বেড়ালদের চেনা সহজ নয়।
ভুষন্ডির কাক (দীর্ঘজীবী)	–	স্ত্রী, পুত্র, কন্যা– সবার মৃত্যুর পরও বৃদ্ধ ভুষন্ডির কাকের মতো বেঁচে আছে।
মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ)	–	এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে যা খুশি তাই করবে?
মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন)	–	যেমন বর, তেমনি কনে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।
মন না মতি (অস্থির মানব মন)	–	মানুষের মন তো বদলেই থাকে; কথায় বলে– 'মন না মতি'।
মাছের মায়ের পুত্রশোক (কপট বেদনাবোধ)	–	নিজের পুত্রের মৃর্তুতে একফোঁটা চোখের পানি পড়ল না– অথচ অন্যের জন্য কাঁদছে, এ যে মাছের মায়ের পুত্রশোক।
মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ)	–	শুনতে মধুর হলেও তার কথাগুলো মিছরির ছুরির মতো অন্তরকে বিদ্ধ করে।
যক্ষের ধন (কৃপণের কড়ি)	–	যক্ষের ধনের মতো সে তার টাকাকড়ি আগলে আছে, এক পয়সাও দান করে না।
রাঘব বোয়াল (সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি)	–	সমাজপতিরা রাঘব বোয়াল হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে।
রাবণের চিতা (চির অশান্তি)	–	'রাবণের চিতাসম জ্বলিছে হৃদয় মম।'
রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতির)	–	আমাদের বড় সাহেব খুব রাশভারি লোক, তাঁর সাথে বুঝেসুঝে কথা বলো।
রুই–কাতলা (পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি)	–	দেশের সুযোগ সুবিধা রুই–কাতলারাই বেশি ভোগ করে।
লেফাফা দুরস্ত (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি)	–	এই লেফাফা দুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয় যে, ইনি কপর্দকশূন্য?
শাঁখের করাত (উভয় সংকট)	–	সত্যকথা বললে বাবার ক্ষতি, আবার মিথ্যাকথা বললে মায়ের ক্ষতি, আমার হয়েছে শাঁখের করাতের অবস্থা।

শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ)	–	আমাকে ফেলে যাওয়ায় আমার রোজগার হলো হাজার টাকা–একেই বলে শাপে বর।
সোনায় সোহাগা	–	'মণি কাঞ্চন যোগ' দ্রষ্টব্য।
সাক্ষী গোপাল (নিষ্ক্রিয় দর্শক)	–	তোমাদের এই পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই।
হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা প্রকাশ করা)	–	আমাকে ঘাঁটিও না বলছি, তা হলে আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।
হাতটান (চুরির অভ্যাস)	–	দামি জিনিসপত্র সাবধানে রেখ, ছেলেটার হাতটান অভ্যাস আছে।
হাড় হাভাতে (হতভাগ্য)	–	সব হারিয়ে ছেলেটি একেবারে হাড় হাভাতে এর কিছু হবে না।
হালে পানি পাওয়া (সুবিধা করা)	–	ব্যবসায় অনেক চেষ্টাই তো করলাম, কিন্তু হালে পানি পেলাম না।

সমার্থক শব্দ

যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক বা একার্থক শব্দ বলে। রচনার মাধুর্য সৃষ্টির জন্য অনেক সময় একটা অর্থকেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়। কবিতায় এর প্রয়োগ বেশি। এখানে কতগুলো সমার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো :

অন্ধকার	–	আঁধার, তমসা, তিমির।
আকাশ	–	অম্বর, গগন, নভঃ, ব্যোম।
আগুন	–	অগ্নি, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন।
ঈশ্বর	–	আল্লাহ, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা।
কান	–	কর্ণ, শ্রবণ।
চুল	–	অলক, কুন্তল, কেশ, চিকুর।
চোখ	–	অক্ষি, চক্ষু, নয়ন, নেত্র, লোচন।
জল	–	অম্বু, জীবন, নীর, পানি, সলিল।
তীর	–	কূল, তট, সৈকত।
দিন	–	দিবস, দিবা।
দেবতা	–	অমর, দেব, সুর।
দেহ	–	গাত্র, গা, তনু, শরীর।
ধন	–	অর্থ, বিত্ত, বিভব, সম্পদ।
পৃথিবী	–	অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী।
পর্বত	–	অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল।
পিতা	–	আব্বা, জনক, বাবা।
পুত্র	–	ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত।
মাতা	–	গর্ভধারিণী, প্রসূতি, মা, জননী।
কোকিল	–	পরভৃত, পিক।
গরু	–	গো, গাভী, ধেনু।
চাঁদ	–	চন্দ্র, নিশাকর, বিধু, শশধর, শশাঙ্ক, সুধাংশু, হিমাংশু।
রাজা	–	নৃপতি, নরপতি, ভূপতি।
সূর্য	–	আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, রবি, সবিতা।
স্বর্গ	–	দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশত।

নদী – তটিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী।
নারী – অবলা, কামিনী, মহিলা, স্ত্রীলোক, রমণী।
মৃত্যু – ইন্তেকাল, ইহলীলা–সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, চিরবিদায়, জান্নাতবাসী হওয়া।
দেহত্যাগ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকান্তরগমন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, স্বর্গলাভ।

সাপ – অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভুজঙ্গ, সর্প।
সমুদ্র – অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু।
হাতি – কর, বাহু, ভুজ, হস্ত।

বাক্যে প্রয়োগ

❈ 'কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'
❈ 'গগনে উদিল রবি লোহিত বরণ।'
❈ দিবসে আলস্যে নিদ্রা অতি দূষণীয়।
❈ অবলা সবলা আজ নহে তো দুর্বলা।
❈ প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপে গলিছে তুষারপিণ্ড।

বিভিন্নার্থক শব্দ

একই শব্দের নানা প্রকার অর্থ থাকলে তাকে বিভিন্নার্থক শব্দ বলে। উদাহরণ–

১। **অঙ্ক**– (১) সংখ্যা – টাকার অঙ্ক কত হবে?
(২) আঁক – অঙ্কটা কষ।
(৩) চিহ্ন – পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) অনসুরণ কর।
(৪) কোল – শিশুকন্যাটিকে অঙ্কে নিয়ে জননী আদর করছেন।
(৫) নাটকের প্রধান পরিচ্ছেদ – এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি খুব করুণ।

২। **অচল**– (১) গতিহীন – শরীর অচল হয়ে পড়েছে।
(২) একনিষ্ঠ – ঈশ্বরে অচল ভক্তি হোক।
(৩) মেকি, অব্যবহার্য – এ অচল টাকা কে নেবে?
(৪) অপ্রচলিত – হাজার টাকার এই নোটটি অচল।
(৫) নির্বাহ করা কঠিন – অর্থের অভাবে সংসার অচল হয়ে গেছে।
(৬) পর্বত – 'উচল বলিয়া অচলে বাড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।'

৩। **অন্তর**–	(১) মন	–	'অন্তর মম বিকশিত কর।'
	(২) অন্য	–	তিনি দেশান্তরে গিয়েছেন।
	(৩) ব্যবধান, পার্থক্য	–	এখান থেকে একঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে।
	(৪) আত্মীয়	–	'অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।'
৪। **কূট**–	(১) কুটিল	–	তার কূট বুদ্ধির সঙ্গে পারবে কেন?
	(২) জটিল	–	এটা কূট প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া কঠিন।
	(৩) কপট, জাল	–	কূট সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে সে এসে ধরা পড়েছে।
	(৪) পর্বতশৃঙ্গ	–	পর্বতকূটে আরোহণ করা দুরূহ।
৫। **গুণ**–	(১) ধর্ম	–	দ্রব্যের গুণ জানতে হয়।
	(২) ক্রিয়া	–	ওষুধে গুণ করেছে।
	(৩) উৎকর্ষ	–	তুমি তো নিজের গুণকীর্তন করছ।
	(৪) উপকরণ	–	শিক্ষার গুণ অনেক।
	(৫) দড়ি	–	মাঝিরা নৌকার গুণ টেনে এসেছে।
৬। **ধর্ম**–	(১) সৎকাজ, পুণ্যকাজ	–	অহিংসা পরম ধর্ম।
	(২) সুনীতি	–	এটা ধর্মসংগত কাজ।
	(৩) সম্প্রদায় বিশেষের উপাসনাপদ্ধতি ইত্যাদি	–	প্রত্যেক ধর্মই মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে।
	(৪) স্বভাব	–	মানুষ ও পশুর ধর্ম পৃথক।
৭। **পক্ষ**	(১) দল	–	তুমি কোন পক্ষে?
	(২) মাসার্ধ	–	দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস।
	(৩) চাঁদের ক্ষয় বা বৃদ্ধি কাল	–	এখন শুক্লপক্ষ।
	(৪) পাখির ডানা	–	যাদের পক্ষ আছে তাদের পাখি বলে।
	(৫) বিয়ে সংখ্যা	–	ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান ।

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে **বিপরীতার্থক শব্দ** বলে।

শব্দের পূর্বে সাধারণত অ, অন, অনা, অপ, অব, দুর, ন, না, নি, নির প্রায়ই না–বাচক বা নিষেধবোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই শব্দের বিরোধার্থক শব্দ তৈরিতে এই উপসর্গগুলো কিছুটা সাহায্য করে। তবে গঠনগত দিক থেকে শব্দের বিপরীতার্থক শব্দগুলো প্রায়ই মূল শব্দের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। উদাহরণ :

শব্দ	বিপরীতার্থক
কাজ	অকাজ
উপচয়	অপচয়
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
কেজো	অকেজো
চেতন	অচেতন
চেনা	অচেনা
জানা	অজানা
জ্ঞানী	অজ্ঞান
ধর্ম	অধর্ম
নশ্বর	অবিনশ্বর
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী
শান্ত	অশান্ত
শিষ্ট	অশিষ্ট
শুভ	অশুভ
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা
অন্ত	অনন্ত
স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গম
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
আচার	অনাচার
আত্মীয়	অনাত্মীয়
আদর	অনাদর
আবশ্যক	অনাবশ্যক
আবিল	অনাবিল
আস্থা	অনাস্থা
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
ইষ্ট	অনিষ্ট
উপস্থিত	অনুপস্থিত

শব্দ	বিপরীতার্থক
সঞ্চয়	ব্যয়
উন্নত	অবনত, অনুন্নত
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
যশ	অপযশ
সবল	দুর্বল
সুকৃত	দুষ্কৃত
সুখ	দুঃখ
সুলভ	দুর্লভ
সুশীল	দুঃশীল
আসল	নকল
আস্তিক	নাস্তিক
লায়েক	নালায়েক
খুঁত	নিখুঁত
খোঁজ	নিখোঁজ
বিরত	নিরত
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
আশা	নিরাশা
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অর্থ	অনর্থ
ধনী	নির্ধন, দরিদ্র
প্রবল	দুর্বল
রোগ	নীরোগ
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
সদয়	নির্দয়
সম্বল	নিঃসম্বল
সরস	নীরস
সাকার	নিরাকার

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
পথ	বিপথ
বাদী	বিবাদী
যুক্ত	বিযুক্ত
সফল	বিফল
সুশ্রী	বিশ্রী
স্মৃতি	বিস্মৃতি
ঠিক	বেঠিক
তাল	বেতাল
হাল	বেহাল
হুঁশ	বেহুঁশ
অগ্র	পশ্চাৎ
অচল	সচল
অনুকূল	প্রতিকূল
অন্তর	বাহির
অধম	উত্তম
উৎসাহ	নিরুৎসাহ
অল্প	অধিক
দোষী	নির্দোষ
আকুঞ্চন	প্রসারণ
আগে	পিছে
আপদ	নিরাপদ
আপন	পর
আদান	প্রদান
আদি	অন্ত
আবির্ভাব	তিরোভাব
আমদানি	রপ্তানি
আয়	ব্যয়

শব্দ	বিপরীতার্থক
অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুরাগ	বিরাগ
ডোবা	ভাসা
তিরস্কার	পুরস্কার
উচ্চ	নিচ
উত্থান	পতন
উদয়	অস্ত
উন্নতি	অবনতি
ঊর্ধ্ব	অধ
এলোমেলো	গোছানো
ওঠা	নামা
ওস্তাদ	সাগরেদ
কৃত্রিম	স্বাভাবিক
কোমল	কর্কশ
ক্রয়	বিক্রয়
ক্ষুদ্র	বৃহৎ
খাঁটি	ভেজাল
খাতক	মহাজন
খুচরা	পাইকারি
খোলা	বন্ধ
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গুরু	লঘু
গৃহী	সন্ন্যাসী
গ্রহণ	বর্জন
ঘাটতি	বাড়তি
ঘাত	প্রতিঘাত
চোর	সাধু
চোখা	ভোঁতা
ছাত্র	অছাত্র
জন্ম	মৃত্যু
জয়	পরাজয়
জড়	চেতন
ভোঁতা	ধারালো

শব্দ	বিপরীতার্থক
আসল	নকল
ইতর	ভদ্র
ইদানীং	তদানীং
লঘু	গুরু
লাভ	ক্ষতি, লোকসান
তেজী	নিস্তেজ
দাতা	গ্রহীতা
দিন	রাত
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দুষ্ট	শিষ্ট
দূর	নিকট
দেওয়া	নেওয়া
দেনা	পাওনা
ধনী	নির্ধন, গরিব
নতুন	পুরাতন
নরম	শক্ত
নিদ্রিত	জাগ্রত
নিন্দা	প্রশংসা
বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু
বর	বৌ
বর্ধমান	ক্ষীয়মান
বড়	ছোট
বাচাল	স্বল্পভাষী
জীবন	মরণ
বেহেশত্	দোজখ
বোকা	চালাক
ব্যর্থ	সার্থক
ভয়	সাহস
ভিতর	বাহির
ভীতু	সাহসী
ভীরু	নির্ভীক
ভূত	ভবিষ্যৎ
উত্তর	দক্ষিণ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
উপকার	অপকার
মান	অপমান
ইহলোক	পরলোক
ইহা	উহা
মিলন	বিরহ
শত্রু	মিত্র
শীঘ্র	বিলম্ব
সত্য	মিথ্যা
সমষ্টি	ব্যাষ্টি
সার্থক	ব্যর্থ
সুন্দর	কুৎসিত
সৃষ্টি	ধ্বংস
স্থির	চঞ্চল
স্মৃতি	বিস্মৃতি
স্বকীয়	পরকীয়
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
স্বর্গ	নরক
স্বাধীন	পরাধীন
হরণ	পূরণ
হার	জিত
হাল্কা	ভারি
হাসি	কান্না
হ্রাস	বৃদ্ধি
জোয়ার	ভাটা
মুখ্য	গৌণ
টাটকা	বাসি
মৃদু	প্রবল
ঠকা	জেতা
রাজা	প্রজা
ঠান্ডা	গরম
রুগ্ণ	সুস্থ
জাগরিত	নিদ্রিত
পূর্ব	পশ্চিম

বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ

- যুদ্ধে জয়–পরাজয় নির্ধারিত হবে।
- ব্যবসায়ে লাভ–ক্ষতি আছেই।
- জীবনে হাসি–কান্না পর্যায়ক্রমে আসে।
- সাগরে জোয়ার–ভাটা পানির হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটে।
- হালকা আর ভারি যন্ত্রগুলো ধোয়ামোছা কর।
- 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?'
- এ জগৎ হরণ–পূরণের মেলা।
- খেলায় হার–জিত থাকবেই।
- পরাধীন হয়ে সুখভোগের চেয়ে স্বাধীন হয়ে দুঃখ ভোগ করাও ভালো।
- ছেলেটি বড়ই চঞ্চল, কিন্তু মেয়েটি কেমন ধীরস্থির।
- সবলের সদম্ভ অত্যাচার দুর্বল আর কতদিন সইবে?
- সাহস দিয়ে ভয়কে জয় কর।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হলো। ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(১) 'কার্যে বিরতি' অর্থে কোন বাগ্‌ধারাটি প্রযোজ্য?

ক. হাত করা　　গ. হাত গুটান
খ. হাত থাকা　　ঘ. হাত আসা

(২) 'পছন্দ হওয়া' অর্থে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?

ক. গোঁ ধরা　　গ. ম্যাও ধরা
খ. মনে ধরা　　ঘ. পথ ধরা

(৩) কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ 'বেহায়া'?

ক. চিনির বলদ　　গ. কান কাটা
খ. জিলাপির প্যাঁচ　　ঘ. ঠোঁট কাটা

(৪) 'সর্বনাশ' বোঝাতে কোন বাগ্‌ধারাটি প্রয়োজন?

ক. ভরাডুবি　　গ. পুকুর চুরি
খ. বালির বাঁধ　　ঘ. মগের মুল্লুক

(৫) কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ 'সম্মান বাঁচানো'?

ক. মুখ ছোটা　　গ. মুখরা
খ. মুখ করা　　ঘ. মুখ ধরা

(৬) কোন বাগ্‌ধারাটির অর্থ 'বিরাট আয়োজন?'

ক. কপাল ফেরা গ. আধকপালে

খ. কড়ায় গন্ডায় ঘ. এলাহিকান্ড

(৭) 'এসপার ওসপার' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?

ক. এদিক অথবা ওদিক গ. এই পাড়ে অথবা ওই পাড়ে

খ. মীমাংসা ঘ. এ রকম অথবা ওই রকম

(৮) 'গোবর গণেশ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?

ক. গোবরের মতো আবর্জনা গ. চালাক

খ. বোকা ঘ. মূর্খ

(৮) 'গোড়ায় গলদ' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?

ক. বেশি ভুল গ. শুরুতে ভুল

খ. ভুল জিনিস ঘ. অল্প ভুল

(১০) 'গোল্লায় যাওয়া' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?

ক. নষ্ট হওয়া গ. অসৎ কাজ করা

খ. খারাপ কাজে যাওয়া ঘ. দোষের কাজ করা

২। বাংলা শব্দের ব্যবহারে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলতে কী বোঝায়?

৩। শব্দের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে তার ব্যবহারিক অর্থের যে ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, তা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

৪। বাগ্‌ধারা বা বাক্যরীতি বলতে কী বোঝ? 'মুখ' অথবা 'হাত' শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৫। বিশেষ্যস্থানীয় ও বিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখিয়ে চারটি করে বাক্য গঠন কর।

৬। নিম্নলিখিত রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশগুলোর অর্থ পাশাপাশি লিখে দাও :

পাকা হাতের লেখা– । গায়ে বাতাস লাগা–

মাথা কাটা যাওয়া– । গা ঢেলে দেওয়া–

হাত গুটিয়ে বসা– । হাত দেওয়া–

হাতে পায়ে ধরা– । বুকে লাগা–

(৭) অর্থের পার্থক্য দেখাও

{ গা লাগা / গায়ে লাগা } { নাম কাটা / নামে কাটা } { ডাক দেওয়া / ডাকে দেওয়া }

{ হাত আসা / হাতে আসা } { মন করা / মনে করা } { মাথা দেওয়া / মাথায় দেওয়া। }

৮। ডানপাশে শব্দ দেওয়া আছে। তার ওপর ভিত্তি করে বাগ্‌ধারা যোগে বাঁ পাশের শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) লোকটার চোখের .... নেই। (লজ্জা)

(খ) ভাইয়ের সঙ্গে .... সম্বন্ধ। (ভীষণ গরমিল)

(গ) এত শোকতাপের পরেও যে বেঁচে আছি তার কারণ আমার তো ....। (যা সহজে মরে না)

(ঘ) .... লোককে বড় কাজের দায়িত্ব দিতে নেই। (অসাবধান)

(ঙ) পরের টাকা হাতে পেলেই অনেক .... করে। (নষ্ট করা)

(চ) এমন .... লোক কমই দেখা যায়। (নির্লজ্জ)

(ছ) তোমার কান্ডকারখানা দেখে আমি তো .... বনে গেছি। (স্তম্ভিত হওয়া)

(জ) বাইরে ধর্মের কথা বলে বেড়ালেও লোকটা আসলে ......। (ভণ্ড)

(ঝ) ‘আমি ভরা তরী করি..........’ (সর্বনাশ)

(ঞ) সমাজপতিরাই .... হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে। (ক্ষমতাশালী ব্যক্তি)

(ট) কে যেন আমার কলমটার .... করেছে। (অপহরণ)

৯। উভয় সারির সামঞ্জস্য বিধান কর।

(১) হাড় হাভাতে	(১) অযথা শ্রম
(২) ভূতের বেগার	(২) একগুঁয়ে
(৩) বালির বাঁধ	(৩) ক্ষণস্থায়ী
(৪) নেই আঁকড়া	(৪) অস্থায়ী বস্তু
(৫) তাসের ঘর	(৫) আশায় নৈরাশ্য
(৬) গুড়ে বালি	(৬) হতভাগ্য

১০। নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারাসমূহ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর।

(১) অমাবস্যার চাঁদ	(১) কেঁচো খুঁড়তে সাপ
(২) আকাশ কুসুম	(১০) গড্ডলিকা প্রবাহ
(৩) আষাঢ়ে গল্প	(১১) তাসের ঘর
(৪) গোড়ায় গলদ	(১২) নয় ছয়
(৫) চাঁদের হাট	(১৩) বালির বাঁধ
(৬) চিনির বলদ	(১৪) রাশভারি
(৭) ডুমুরের ফুল	(১৫) রুই কাতলা
(৮) কলুর বলদ	(১৬) হাতটান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাচ্য এবং বাচ্য পরিবর্তন

১. রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' লিখেছেন।

২. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'গীতাঞ্জলি' লিখিত হয়েছে।

৩. আমার খাওয়া হলো না।

ওপরের প্রথম বাক্যে কর্তার, দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের, তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে।

বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় 'বাচ্য'।

বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার : (১) কর্তৃবাচ্য (২) কর্মবাচ্য ও (৩) ভাববাচ্য।

কর্তৃবাচ্য : যে বাক্যে কর্তার অর্থ–প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন– ছাত্ররা অঙ্ক করছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সর্বদাই কর্তার অনুসারী হয়।

২. কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যথা– শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান। রোগী পথ্য সেবন করে।

কর্মবাচ্য : যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন– শিকারি কর্তৃক ব্যাঘ্র নিহত হয়েছে।

১. কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক অনুসর্গের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারী হয়। যথা – আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়। চোরটা ধরা পড়েছে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যথা– আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।

ভাববাচ্য : যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন–

(ক) আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) খাওয়া হলো না। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)

(খ) আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) এখন যেতে হবে। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)

(গ) তোমার দ্বারা (কর্তায় তৃতীয়) এ কাজ হবে না। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্ম দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন–

এ পথে চলা যায় না।

এবার ট্রেনে ওঠা যাক।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূল ক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভিন্ন অর্থে ভাববাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন– এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না। এ রাস্তা আমার চেনা নেই।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

(১) কর্তায় তৃতীয়া (২) কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং (৩) ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়।

জ্ঞাতব্য : কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে সেই বাক্যের কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
(ক) বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	(ক) বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।
(খ) খোদাতায়ালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।	(খ) বিশ্বজগৎ খোদাতায়ালা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।
(গ) মুবারক পুস্তক পাঠ করছে।	(গ) মুবারক কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।

লক্ষণীয় : কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

(১) কর্তায় ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং (২) ক্রিয়া নাম পুরুষের হয়। যেমন–

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
(ক) আমি যাব না।	(ক) আমার যাওয়া হবে না।
(খ) তুমিই ঢাকা যাবে।	(খ) তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে।
(গ) তোমরা কখন এলে?	(গ) তোমাদের কখন আসা হলো?

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিয়ম : কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

(১) কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা শূন্য বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন–

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
(ক) দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।	(ক) দস্যুদল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।
(খ) হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।	(খ) হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করেন।

ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিয়ম : ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে–

(১) কর্তায় প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়। যেমন–

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
(ক) তোমাকে হাঁটতে হবে।	(ক) তুমি হাঁটবে।
(খ) এবার একটি গান করা হোক।	(খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।
(গ) তার যেন আসা হয়।	(গ) সে যেন আসে।

কর্মকর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্যের বাক্য বলা হয়। যেমন–

কাজটা ভালো দেখায় না।
বাঁশি বাজে এ মধুর লগনে।
সুতি কাপড় অনেক দিন টেকে।

অনুশীলনী

১। ঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(১) কর্মবাচ্যে কর্তার কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা গ. দ্বিতীয়া
খ. তৃতীয়া ঘ. ষষ্ঠী

(২) ভাববাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?

ক. ষষ্ঠী গ. প্রথমা
খ. দ্বিতীয়া ঘ. ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া

(৩) কর্তৃবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?

ক. দ্বিতীয়া
খ. ষষ্ঠী
গ. শূন্য
ঘ. দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য

(৪) কর্মবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা
খ. দ্বিতীয়া
গ. তৃতীয়া
ঘ. কখনো প্রথমা, কখনো দ্বিতীয়া

(৫) দোষী ছাত্রটিকে জরিমানা করা হয়েছে। – এখানে 'ছাত্রটিকে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. কর্তায় দ্বিতীয়া
খ. কর্মে দ্বিতীয়া
গ. করণে দ্বিতীয়া
ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া

(৬) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া কী হলে কর্মবাচ্য হয় না?

ক. সমাপিকা
খ. অসমাপিকা
গ. সকর্মক
ঘ. অকর্মক

(৭) ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করলে কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?

ক. দ্বিতীয়া
খ. প্রথমা
গ. তৃতীয়া
ঘ. ষষ্ঠী

(৮) 'করিম পুস্তক পাঠ করছে।' বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিণত করলে হবে–

ক. পুস্তক করিম কর্তৃক পাঠ হচ্ছে।
খ. করিম কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।
গ. পুস্তক কর্তৃক করিম পঠিত হচ্ছে।
ঘ. করিম কর্তৃক পুস্তক পাঠ করছে।

(৯) তুমি কখন এলে? – বাক্যটিকে ভাববাচ্যে পরিণত করলে কোনটি হবে?

ক. তোমার দ্বারা কখন আসা হলো?
খ. তুমি কখন আসা হলো?
গ. তুমি দ্বারা কখন আসা হলো?
ঘ. তোমার কখন আসা হলো?

২। 'বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকেই বাচ্য বলা হয়।' – এ উক্তিটির সমর্থনে বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির উদাহরণ দাও।

৩। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

৪। বাক্যে উদাহরণ দাও।

ক) ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হতে পারে।

খ) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

গ) কর্তৃবাচ্যের তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে ক্রিয়াজাত বিশেষণ (Participle) – রূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। কর্মকর্তৃবাচ্য বলতে কী বোঝ? উদাহরণযোগে বিশদ আলোচনা কর।

৬। বাচ্যান্তর কর।

(ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে

ক) আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।

খ) মহাকবি ফেরদৌসী শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।

গ) শিকারি বাঘ মেরেছে।

ঘ) আমি বইটি পড়েছি।

(খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে

ক) কাফেলা দস্যুদল দ্বারা আক্রান্ত হলো।

খ) স্থপতি ঈসা রুমীর তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে।

গ) বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারত রচিত হয়েছিল।

ঘ) পিতা কর্তৃক পুত্র বিতাড়িত হয়েছে।

৭। কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে এবং ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন কর।

ক) আমি একাই যাব।

খ) এবার একখানা গান হোক।

গ) আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।

৮। বাচ্যের ব্যবহারে ভুল থাকলে শুদ্ধ করে লেখ।

ক) পিতা কর্তৃক আমি একটি কলম দান করা হইয়াছি।

খ) আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজে।

গ) তোমার যাওয়া হউক আমি যাওয়া হবে না।

ঘ) ছাত্রগণ তোমাদিগ কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শুনা হউক।

ঙ) শাসন করা তাকেই সাজে, সোহাগ করে যে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উক্তি পরিবর্তন

কোনো কথকের বাক কর্মের নামই উক্তি। উক্তি দুই প্রকার : প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যথা – তিনি বললেন, "বইটা আমার দরকার।"

যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে রূপান্তরিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা :

তিনি বললেন যে বইটা তাঁর দরকার।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম

১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু উদ্ধরণ চিহ্নের (" ") অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়। প্রথম উদ্ধরণ চিহ্ন স্থানে 'যে' এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি : খোকা বলল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।"

পরোক্ষ উক্তি : খোকা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

২. বাক্যের অর্থ–সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল, "আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।"

পরোক্ষ উক্তি : রশিদ বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।"

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন	এখানে	সেখানে
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন	এখন	তখন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন		
আজ	সেদিন	ওখানে	ঐখানে		

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি** : ছেলে লিখেছিল, "শহরে খুব গরম পড়েছে।"

পরোক্ষ উক্তি : ছেলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল।

অথবা, ছেলে লিখেছিল শহরে খুব গরম পড়েছে।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল, "আমি বাজারে যাচ্ছি।"

পরোক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

গ) প্রত্যক্ষ উক্তি : মনসুর বলল, "আমি ঢাকা যাব।"

পরোক্ষ উক্তি : মনসুর বলল যে, সে ঢাকা যাবে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন–

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

পরোক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৭। প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রশ্নবোধক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি ছুটি চাও?"

পরোক্ষ উক্তি : আমরা ছুটি চাই কি না, শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করলেন।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা বললেন, "কবে নাগাদ তোমাদের ফল বের হবে?"

পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ফল কবে নাগাদ বের হবে, বাবা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : হামিদ বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।"

পরোক্ষ উক্তি : হামিদ তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন।"

পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

আবেগসূচক বাক্য

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি বলল, "বাঃ! পাখিটি তো চমৎকার।"

পরোক্ষ উক্তি : লোকটি আনন্দের সাথে বলল যে, পাখিটি চমৎকার।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তি : ভিখারিনী দুঃখের সাথে বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"

পরোক্ষ উক্তি : ভিখারিনী দুঃখের সাথে বলল যে, তারা শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উত্তর দেওয়া হয়েছে। সর্বোত্তমটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(১) খোকা তোমাকে বলল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।" এর পরোক্ষ উক্তি হবে–

ক. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি নেই।

খ. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

গ. খোকা তোমাকে বলল যে তোমার বাবা বাড়ি নেই।

ঘ. খোকা তোমাকে বলল যে, আমার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

(২) রহমান আমাকে বলল, "আমি এক্ষুণি আসছি।" – পরোক্ষ উক্তিতে হবে–

ক. রহমান আমাকে বলল যে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি

খ. রহমান আমাকে বলল যে সে এক্ষুণি আসছে।

গ. রহমান আমাকে বলল যে, তুমি তক্ষুণি যাচ্ছ।

ঘ. রহমান আমাকে বলল যে সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

(৩) হামিদ বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।" – পরোক্ষ উক্তিতে হবে–

ক. হামিদ তাদের পরদিন আসতে বলল।

খ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন আগামীকাল আসে।

গ. হামিদ বলল যে তোমরা পরদিন এসো।

ঘ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন পরদিন আসে।

(৪) করিম তোমাকে বলল, "আমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।" – পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?

ক. করিম তোমাকে বলল যে সে গতকাল ঢাকা গিয়েছিল।

খ. করিম তোমাকে বলল যে সে আজ ঢাকা গিয়েছিল।

গ. করিম তোমাকে বলল যে, তুমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলে।

ঘ. করিম তোমাকে বলল যে সে আগেরদিন ঢাকা গিয়েছিল।

(৫) রেবা আমাকে বলল, "ভাই, তুমি কবে এখানে আসবে?" – পরোক্ষ উক্তিতে হবে–

ক. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে বলল যে আমি কবে এখানে আসব।

খ. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে জানতে চাইল যে আমি কবে সেখানে যাব।

গ. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে বলল যে আমি কবে সেখানে যাব।

ঘ. রেবা আমাকে বলল, তুমি কবে সেখানে আসবে।

২। উক্তি বলতে কী বোঝ? উক্তি কয় প্রকার ও কী কী?

৩। প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিশেষ স্থলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা পাশাপাশি লিখে শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) প্রত্যক্ষ উক্তির..... উঠে যায় এবং প্রথম উদ্ধরণ চিহ্ন স্থানে .... সংযোজক অব্যয়টি বসাতে হয়।

(খ) প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম পদ পরোক্ষ উক্তিতে বাক্যের....... রক্ষা করে পরিবর্তন করতে হয়।

(গ) প্রত্যক্ষ উক্তির স্থানবাচক ও কালবাচক শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে........... হয়।

(ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়া বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের হলে পরোক্ষ উক্তিতে তা........ .... কালের কিংবা.............. কালেরও হতে পারে।

৪। সংক্ষেপে জবাব দাও : প্রত্যক্ষ উক্তির কোন কোন স্থলে পরোক্ষ উক্তিতে কোনো পরিবর্তন হয় না?

৫। নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন কর।

(ক) সে বলল, ''তা কি হয়? তোমাকে এখন যেতে দিচ্ছে কে? দয়া করে আমার সঙ্গে চল।''

(খ) সেনাপতি বললেন, ''মহারাজ আমরা থাকতে আপনি কেন যুদ্ধে যাবেন? আজই শত্রুদের বন্দি করে আনব। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের যেতে অনুমতি দিন।''

(গ) শিক্ষক বললেন, ''পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।"

(ঘ মা বললেন, "সুমন, দেরি না করে চলে এসো। পড়তে বসো। মন দিয়ে পড়ো। কাল তোমার পরীক্ষা মনে নেই?"

(ঙ) নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।" ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, কী কথা শুনি।" ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।" রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?" ভাগিনা বলিল, "আরে রাম।" "আর কি উড়ে?" "না।" "দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?" "না।" রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আন দেখি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যতি বা ছেদচিহ্নের লিখন কৌশল

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য–গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা–ই যতি বা ছেদচিহ্ন।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো:

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি–কাল–পরিমাণ
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	ঐ
বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন	!	ঐ
কোলন	:	ঐ
ড্যাস	–	ঐ
কোলন ড্যাস	:–	ঐ
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	,	থামার প্রয়োজন নেই।
উদ্ধরণ চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে।
ব্র্যাকেট (বন্ধনী–চিহ্ন)	( )	থামার প্রয়োজন নেই।
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই।
	[ ]	থামার প্রয়োজন নেই।

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার

১. কমা {পাদচ্ছেদ (,)}

ক) বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ–বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন– সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

খ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন– সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ) সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন– রশিদ, এদিকে এসো।

ঘ) জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন– কাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পূর্বপরিচিত।

ঙ) উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে। যেমন– সাহেব বললেন, "ছুটি পাবেন না।"

চ) মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর 'কমা' বসবে। যেমন– ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯৯ সন।

ছ) বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন– ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা–১০০০।

জ) নামের পরে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে। যেমন– ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, এম.এ. পি–এইচ.ডি।

২. সেমিকোলন (;)

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে। যথা– সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুশ্ছেদ্য?

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।)

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যথা– শীতকালে এ দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন– তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

৫. বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এ সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন–

আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।

জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন স্থলে কমা চিহ্নের ব্যবহার করা হয়।

৬. কোলন (:)

একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন–

সভায় সাব্যস্ত হলো : একমাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৭। ড্যাস চিহ্ন (–)

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন–

তোমরা দরিদ্রের উপকার কর– এতে তোমাদের সম্মান যাবে না–বাড়বে।

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস চিহ্ন একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন–পদ পাঁচ প্রকার:–

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

৮. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (–)

সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেনের ব্যবহার হয়। যেমন– এ আমাদের শ্রদ্ধা–অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি–উপহার।

৯. ইলেক (') বা লোপ চিহ্ন

কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য (') লোপচিহ্ন দেওয়া হয় । যেমন–

মাথার 'পরে জ্বলছে রবি ('পরে=ওপরে)

পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা=কাহারা)

১০. উদ্ধরণ চিহ্ন (" ")

বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যথা–শিক্ষক বললেন, "গতকাল তুরস্কে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছে।"

১১. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ( ), { }, [ ]

এই তিনটি চিহ্নই গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন – ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

(ক) ধাতু বোঝাতে (√) চিহ্ন : √স্থা =স্থা ধাতু।

(খ) পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন: জাঁদরেল < জেনারেল।

(গ) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন: গঙ্গা > গাঙ।

(ঘ) সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন : নর ও নারী = নরনারী।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উত্তরের মধ্যে সর্বোত্তমটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও।

(i) বাক্যে কমা (,) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. $\frac{১}{২}$ সেকেন্ড
খ. $\frac{৩}{৪}$ সেকেন্ড
গ. এক সেকেন্ড
ঘ. এক বলতে যে সময় লাগে

(ii) বাক্যে সেমিকোলন (;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. ১ বলতে যে সময় লাগে
খ. ১ $\frac{১}{২}$ বলার দ্বিগুণ সময়
গ. ১ সেকেন্ড
ঘ. ২$\frac{১}{২}$ সেকেন্ড

(iii) বাক্যের শেষে দাঁড়ির পর কতক্ষণ থেমে পরের বাক্য পড়তে হয়?

ক. ১ সেকেন্ড
খ. ১$\frac{১}{২}$সেকেন্ড
গ. ২ সেকেন্ড
ঘ. সেকেন্ড

(iv) হাইফেন (–)–এরপর কতক্ষণ থামতে হয়?

ক. ১ সেকেন্ড
খ. ১$\frac{১}{২}$ সেকেন্ড
গ. ২ সেকেন্ড
ঘ. থামার প্রয়োজন নেই।

(v) সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে?

ক. সেমিকোলন
খ. কমা
গ. দাঁড়ি
ঘ. কোনো চিহ্নই নয়

(vi) ধাতু বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. <
খ. –
গ. √
ঘ. >

(vii) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. >
খ. <
গ. √
ঘ. :

(viii) পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

ক. √
খ. :
গ. >
ঘ. <

২। যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের আবশ্যকতা কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। আমরা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কী কী ছেদচিহ্নের ব্যবহার করে থাকি? প্রত্যেকটি চিহ্নের নাম, রূপ এবং তজ্জনিত বিরামের কাল–পরিমাণ নির্দেশ কর।

৪। স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার দেখাও :

(ক) বিস্ময় চিহ্ন ও সম্বোধন চিহ্ন

(খ) উদ্ধরণ চিহ্ন ও লোপ চিহ্ন

(গ) ড্যাস চিহ্ন ও হাইফেন চিহ্ন

(ঘ) ধাতুর চিহ্ন ও সমানবাচক চিহ্ন।

৫। সংক্ষেপে জবাব দাও :

(ক) কোলন ও কোলন–ড্যাস চিহ্ন ব্যবহারের পার্থক্য কী?

(খ) সন্দেহ বা ব্যঙ্গ বোঝাতে তুমি কোন প্রকারের যতিচিহ্নের ব্যবহার করবে?

(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে কমা চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়?

৬। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিতে যতিচিহ্ন বসিয়ে আবার লেখ।

প্রভাত হলো সোহরাব ময়দানে এসে হাঁকলেন ইরানশাহ কায়কাউস আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি ইরান শাহ চুপ কেন উত্তম তবে কি ইরানী ফৌজে এমন পাহ্‌লোয়ান নেই যে আমার সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষা করতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

স্বরভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গি

১. অ–নে–ক অ–নে–ক দিন আগে বাংলাদেশে বিজয় সিংহ নামে খুব সাহসী এক রাজপুত্র ছিলেন।

২. প্রকৃতি কী সুন্দর সাজেই না সেজেছে!

৩. তাজ্জব ব্যাপার!

৪. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

৫. 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।'

৬. 'দীর্ঘজীবী হও।'

৭. 'সবারে বাস রে ভালো।'

৮. উঠে বস।

ওপরের প্রথম বাক্যটি বিবৃতিমূলক; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দুটি বিস্ময়সূচক; চতুর্থ বাক্যটি প্রশ্নসূচক; পঞ্চম বাক্যটি প্রার্থনামূলক; ষষ্ঠ বাক্যটি আশীর্বাদবোধক; সপ্তম বাক্যটি অনুরোধমূলক; অষ্টম বাক্যটি আদেশসূচক।

হাসি–কান্না, সুখ–দুঃখ, আবেগ–উচ্ছ্বাস, অনুরোধ–প্রার্থনা, আদেশ–মিনতি, শাসন–তিরস্কার কণ্ঠস্বরের নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বিশেষ জোর দিয়ে কথা বলা, কণ্ঠস্বরের ওঠা–নামা, কাঁপন, টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা বাক্যের বিশেষ বিশেষ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন ভঙ্গিতে কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণের ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা নানা প্রকার ভাব ও অর্থ সৃষ্টি করে। এই ধ্বনি-তরঙ্গ বা স্বরতরঙ্গকে স্বরভঙ্গি বলে। এই স্বরভঙ্গিই বাগ্‌ভঙ্গির ভিত্তি।

স্বরভঙ্গির দ্বারা যে শব্দ ও বাক্য সৃষ্ট ও উচ্চারিত হয়, তাকে লিখিত আকারে এবং উচ্চারিত অবস্থায় বাগ্‌ভঙ্গি বলা যেতে পারে।

বাক্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে।

১. **বিবৃতিমূলক বাক্য** (Assertive sentence) : সাধারণভাবে হ্যাঁ বা না বাচক বাক্য। বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার হতে পারে : হ্যাঁবাচক বাক্য (Affirmative sentence) এবং না বাচক বাক্য (Negative sentence)।

উদাহরণ–হ্যাঁ বাচক বাক্য : সে ঢাকা যাবে। আমি বলতে চাই।

না বাচক বাক্য : সে ঢাকা যাবে না। আমি বলতে চাই না।

২. প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative sentence) : এ ধরনের বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যথা :

কোথায় যাচ্ছ? কী পড়ছ? কেন এসেছ? যাবে নাকি?

৩. বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory sentence) : যে বাক্যে আশ্চর্যজনক কিছু বোঝায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যথা :

তাজ্জব ব্যাপার! সমুদ্রের সে কী ভীষণ গর্জন, ঢেউগুলো পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু– আমি তো ভয়ে মরি! হুররে, আমরা জিতেছি!

৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য (Optative sentence) : এ ধরনের বাক্যে শুভজনক প্রার্থনা, আশিস, আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যথা :

তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর তোমাকে জয়ী করুন। পরীক্ষায় সফল হও। দীর্ঘজীবী হও।

৫. আদেশ বাচক বাক্য (Imperative sentence) : এ ধরনের বাক্যে আদেশ করা হয়। যথা :

শিক্ষক মহোদয় শ্রেণিকক্ষে এলে উঠে দাঁড়াবে। চুপটি করে বস। উঠে দাঁড়াও । দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।

স্বরভঙ্গি তথা বাগ্‌ভঙ্গির সাহায্যে ক্রোধ, আদর, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, বিস্ময়, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। যথা :

১. সাধারণ বিবৃতিতে	:	সে আজ যাবে ।
২. জিজ্ঞাসায়	:	সে আজ যাবে?
৩. বিস্ময় প্রকাশে	:	সে আজ যাবে!
৪. ক্রোধ প্রকাশে	:	আমি তোমাকে দেখে নেব।
৫. আদর বোঝাতে	:	বড্ড শুকিয়ে গেছিস রে।
৬. আনন্দ প্রকাশে	:	বেশ বেশ, খুব ভালো হয়েছে!
৭. দুঃখ প্রকাশে	:	আহা, গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙেছে!
৮. বিরক্তি প্রকাশে	:	আঃ, ভালো লাগছে না, এখন এখান থেকে যাও তো।
৯. ভীতি প্রদর্শনে	:	যাবি কি না বল?
১০. লজ্জা প্রকাশে	:	ছিঃ ছিঃ, তার সঙ্গে পারলে না।
১১. ধিক্কার দিতে	:	ছিঃ, তোমার এই কাজ!
১২. ঘৃণা প্রকাশে	:	তুমি এত নীচ!
১৩. অনুরোধ প্রকাশে	:	কাজটি করে দাও না ভাই।
১৪. প্রার্থনা	:	ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ছেদ ও বিরতিসূচক চিহ্নগুলো বাগ্‌ভঙ্গির লিখিত আকার প্রকাশে সাহায্য করে। দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক চিহ্ন বাক্যের ভাব ও অর্থবোধের জন্য উপকারক।

অনুশীলনী

১। চারটি উত্তরের সর্বোত্তমটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(১) কোনটি আদেশসূচক বাক্য?

ক. তোমাকে বসতে বলেছি। গ. তুমি কি বসবে?

খ. এখানে এস। ঘ. বসলে খুশি হব

(২) "সে কি যাবে" –এটি কী ধরনের বাক্য?

ক. আদেশসূচক গ. বিবৃতিমূলক

খ. বিস্ময়সূচক ঘ. প্রশ্নসূচক

(৩) " আমি তোমাকে স্নেহ করি।" এটি কী ধরনের বাক্য?

ক. প্রশ্নসূচক গ. বিস্ময়সূচক

খ. বিবৃতিমূলক ঘ. আদেশমূলক?

(৪) কোনটি প্রশ্নসূচক বাক্য?

ক. কী খেলাই খেললে গ. আমি খেলব না

খ. তুমি অবশ্যই খেলবে গ. তুমি কি খেলেছ

(৫) "তোমাকে আজই যেতে হবে।" এটা কী ধরনের বাক্য?

ক. বিস্ময়সূচক গ. আদেশসূচক

খ. প্রার্থনামূলক ঘ. বিবৃতিমূলক

(৬) "কী সাংঘাতিক ব্যাপার।" – এটা কী ধরনের বাক্য?

ক. বিবৃতিমূলক গ. প্রশ্নমূলক

খ. বিস্ময়সূচক ঘ. অনুরোধবাচক

(৭) ''কোথায় যাচ্ছ?"– এটা কী ধরনের বাক্য ?

ক. বিস্ময়সূচক গ. প্রশ্নমূলক

খ. বিবৃতিমূলক ঘ. অনুরোধমূলক

(৮) "এখানে এসো।"– এটা কী ধরনের বাক্য ?

ক. অনুরোধজ্ঞাপক
খ. আদেশমূলক
গ. বিবৃতিমূলক
ঘ. বিস্ময়সূচক

(৯) বাগ্‌ভঙ্গি কী?

ক. শব্দভঙ্গি
খ. বাক্যভঙ্গি
গ. নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণ
ঘ. মুখভঙ্গি

(১০) কোনটি বিস্ময়সূচক বাক্য?

ক. কী করবে?
খ. জয়ী হও।
গ. সকলের মঙ্গল হোক।
ঘ. কী সুন্দর ফুল!

২। স্বরভঙ্গি কাকে বলে ?

৩। বাগ্‌ভঙ্গি বলতে কী বোঝ?

৪। বাগ্‌ভঙ্গি অনুযায়ী কয় প্রকার বাক্য গঠন সম্ভব?

৫। বাগভঙ্গির সাহায্যে কী কী ধরনের বাক্য গঠন করা যায়?

৬। আদেশসূচক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৭। বিস্ময়সূচক বাক্য বলতে কী বোঝ? এ ধরনের দুটি বাক্যের উদাহরণ দাও।

৮। বিবৃতিমূলক বাক্য কাকে বলে? এ ধরনের বাক্য কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৯। প্রার্থনামূলক বাক্য কাকে বলে উদাহরণসহ লেখ।

১০। ক্রোধ প্রকাশক এবং আনন্দবাচক বাক্যের উদাহরণ দাও।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাক্যে পদ সংস্থাপনার ক্রম

(Syntax)

বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলো উপযুক্ত স্থানে বসানোই পদ সংস্থাপনার ক্রম। একে কেউ কেউ পদক্রম বলে থাকেন।

নিয়মাবলি

১. সাধারণ বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য (বা কর্তা) এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় (বা ক্রিয়াপদ) বসবে। যেমন –

মনোযোগী	ছাত্ররাই	রীতিমত	পড়াশোনা করে।
(সম্প্রসারক)	কর্তৃপদ	(সম্প্রসারক)	(ক্রিয়াপদ)

কিন্তু বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন –

লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর।

২. সম্বন্ধ পদ বিশেষ্যের পূর্বে বসবে । যেমন –" ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।"

অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য বা ছন্দের অনুরোধে সম্বন্ধ পদ পরেও বসতে পারে। যেমন –

"হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার।"

৩. কারক–বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে। যেমন –

লোকটি ব্যবহারে খুবই ভদ্র। রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার।

৪. বিধেয় বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের পরে বসে। যথা : লোকটি যে জ্ঞানী তাতে সন্দেহ নেই।

৫. বাক্যের প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন – আমি 'শাহনামা' পড়েছি।

(ক) কবিতায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – 'লহ নমস্কার, সুন্দর আমার।'

(খ) বাক্যে জোর দিতে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – জানি, তোমার মুরোদ কতটুকু।

৬. বহুপদময় বিশেষণ অবশ্যই বিশেষ্যের পূর্বে বসে। যেমন – তোমার দাঁত বের–করা হাসি দেখলে সবারই পিত্ত জ্বলে যায়।

বাক্যে 'না ' বা 'নে' অব্যয়ের ব্যবহার

(ক) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে । যথা – আমি যাব না । আমি ভাত খাই নে, রুটি খাই।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা – না চাইতে দানের কোনো মর্যাদা নেই।

(গ) বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন – না ভালো, না মন্দ।

(ঘ) 'যদি' দিয়ে বাক্য আরম্ভ করলে 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে । যেমন : তুমি যদি আজ না যাও, তা হলে খুবই ক্ষতি হবে।

'না' (নঞ ব্যতীত) অন্য অর্থে

ক. বিকল্পার্থে : জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যে – তুমি বাড়ি যাবে, না আমি যাব?

খ. অনুরোধ বা আদেশ অর্থে (নিরর্থকভাবে বাক্যের শেষে) : একটা গান গাও না ভাই।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হলো। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাওঃ

(i) বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোথায় বসে?

ক. প্রথমে
খ. শেষে
গ. উদ্দেশ্যের পূর্বে
ঘ. অব্যয় পদের পর

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের কোথায় বসে?

ক. প্রথমে
খ. শেষে
গ. বিশেষণের পূর্বে
ঘ. বিশেষ্যের পর

(iii) বাক্যে বিধেয়–বিশেষণ কোথায় বসে?

ক. প্রথমে
খ. শেষে
গ. বিশেষণের পূর্বে
ঘ. বিশেষ্যের পর

(iv) বাক্যে বহুপদময় বিশেষণ কোথায় বসে?

ক. প্রথমে
খ. বিশেষ্যের পূর্বে
গ. সর্বনামের পূর্বে
ঘ. শেষে

(v) 'না' শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?

ক. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে
খ. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে
গ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে
ঘ. বিশেষণের পরে

(vi) বাক্যে কারক–বিভক্তিযুক্ত পদ কোথায় বসে?

ক. প্রথমে
খ. শেষে
গ. বিশেষ্যের পূর্বে
ঘ. বিশেষণের আগে

(vii) সম্বন্ধ পদ বাক্যে কোথায় বসে?

ক. বিশেষ্যের পূর্বে
খ. বিশেষণের পূর্বে
গ. বিশেষ্যের পরে
ঘ. বিশেষণের পরে।

২। বাক্যে পদ সংস্থাপনের ক্রম বলতে কী বোঝ? এর উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

৩। বাক্যে পদ সংস্থাপনের ক্রম বিষয়ে পাঁচটি নিয়ম আলোচনা কর।

৪। 'না' অব্যয়টি যদি নঞ ব্যতীত অন্য অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হয়, তবে সেটি কী কী অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৫। বাক্যে উদাহরণ দাও :

(ক) বাক্যে জোর দিতে গেলে ক্রিয়াপদ বাক্যের প্রথমেও ব্যবহৃত হতে পারে।

খ) স্থান ও কালের অর্থ বিশদভাবে বোঝানোই অধিকরণ কারকের উদ্দেশ্য, কাজেই বাক্যে অধিকরণ কারকের অবস্থানে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

সমাপ্ত

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কারও মনে কষ্ট দিও না

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :